(nerve-current); এইরূপ অর্থ করিয়া এখনকার শারীরবিজ্ঞানের সহিত কোন প্রকারে মিলান যাইতে পারে। বৈদ্যশাস্ত্রে "বায়ু-প্রকৃতি"র যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত nervous temperamentএর অনেকটা মিল দেখা যায়। তাই মনে হয়, এই সকল "বায়ুর" অর্থ সাধারণ বায়ু না হইলেও হইতে পারে। তবে, এ বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না।
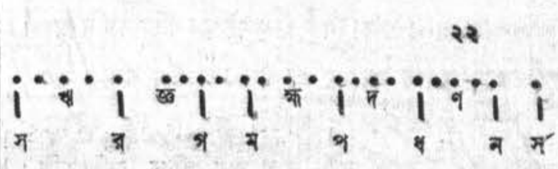
২। নাদ-ব্রহ্ম কেন বলা হয়? ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ ও জগৎ-প্রপঞ্চের অদ্বিতীয় কারণ; নাদও গীতাদি-জনিত আনন্দের মূল ও সমুদয় বাক্-প্রপঞ্চের অদ্বিতীয় কারণ। সঙ্গীতরত্নাকর-প্রণেতা শার্ঙ্গদেবের মতে, নাদ ব্রহ্ম না হইলেও ব্রহ্মশক্তি বটে। রাগ-বিবোধে এই ব্রহ্মশক্তিকেই সরস্বতী বলা হইয়াছে।

৩। শ্রুতি কাহাকে বলে?—এই বিষয়ে "ঐতিহাসিক রহস্যে" যে একটি বিশদ ব্যাখ্যা আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

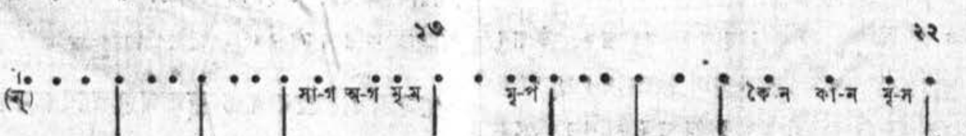
"যত নিম্ন হইতে পারে, তত নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া যত উচ্চ হইতে পারে, তত উচ্চ একটি ধ্বনি-রেখা কল্পনা কর। রেখা পদার্থ কি?—তাহা সকলেই জানেন। রেখা কতকগুলি পর-পর-সংযুক্ত বা সংলগ্ন বিন্দুর সমষ্টি; সুতরাং ধ্বনি-রেখাটিও কতকগুলি উত্তরোত্তর সংলগ্ন ধ্বনি-বিন্দুর সমষ্টি। ইচ্ছানুসারে, এই ধ্বনি-রেখার কোন একটি স্থানকে বা কোন এক বিন্দুকে ভিত্তি বা মূল-সীমা করিয়া তাহার উর্দ্ধভাগের কোন এক বিন্দুকে শেষ সীমা কল্পনা কর। এই বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী স্বর-রেখাকে ক্রমোচ্চরূপে অগ্রে এইরূপ উচ্চারণ কর—যেরূপ উচ্চারণ করিলে সা হইতে নি পর্য্যন্ত স্বরটি অবিভাগে উচ্চারিত হয়। মনে কর, যেন প্রথম বিন্দুকে অবলম্বন করিয়া স, রি, গ, ম ইত্যাদি বর্ণোচ্চারণ না করিয়া, কেবল অবিভাগে ও ক্রমোচ্চরূপে সা-আ-আ-আ-আ-আ-আ—এইরূপ উচ্চারণ করিলে। এই ধ্বনি-রেখাটিকে যদি ভাগ করিতে হয়, তবে যুক্তি ইহাকে অনেক ভাগ করিতে বলিবে। কিন্তু অত্যন্ত অনেক ভাগ করিলে তাহা অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে। এই জন্য, সঙ্গীতাচার্য্যেরা উহাকে স্থূলতঃ বা মোটামুটি সাত ভাগ করিয়া গিয়াছেন। সেই সাত ভাগ সাত স্বর বলিয়া গ্রহণ কর। কিন্তু দেখিবে যে, সেই সাত ভাগ সমান সাত ভাগ নহে। যেহেতু, ভাগ-লব্ধ স্বরগুলি পরপর সমান্তরাল বা উত্তরোত্তর সম-পরিমাণে উচ্চ নহে। সুতরাং তাহা ঠিক্ সমান সাত ভাগ নহে। সমান সাত ভাগ না হইবার হেতু এই যে, স্বরগুলিকে ছোট-বড় নানা আকারে প্রকাশ করিতে না পারিলে গান ক্রিয়া উত্তম হয় না। অতএব সেই ন্যূনাধিক সাত ভাগকে একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুগত রাখিবার উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে। সে উপায় এই:—পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড-দণ্ডায়মান ধ্বনি-রেখাকে সাত ভাগ না করিয়া, ২২ ভাগ করিয়া তাহার ২।৩।৪ অংশ একত্র করিয়া এক-একটি স্বরকে এক-একটি নির্দ্দিষ্ট নাম দিয়া গ্রহণ কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, সপ্তধা বিভক্ত স্বরের মধ্যে কোনটিতে ২, কোনটিতে ৩, কোনটিতে ৪ বিন্দু আছে। এই বিন্দুগুলিই শ্রুতি।"

৪। আধুনিক ও প্রাচীন মতে যেরূপ শ্রুতি-বিভাগ অবলম্বন করিয়া সপ্তস্বর নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা বিন্দুর দ্বারা নিম্নে প্রদর্শিত হইবে। উভয়েতেই ২২ শ্রুতি, কিন্তু সংস্থান বিভিন্ন।

আধুনিক শ্রুতি বিভাগ।



রাগ-বিবোধে শ্রুতি-বিভাগ।



সা-গ=সাধারণ গ; অ-গ=অন্তর গ; মৃ-ম=মৃদু ম; মৃ-প=মৃদু প; কৈ-ন=কৈশিকী ন; কা-ন=কাকলী-ন; মৃ-স=মৃদু স। ন্-হইতে শ্রুতি গণনা করিলে ম ত্রয়োদশীতে পড়ে (১৭ শ্লোক দেখ); এবং স-হইতে শ্রুতি গণনা করিলে প ত্রয়োদশীতে পড়ে (২১ শ্লোক দেখ): উপরি লিখিত আদর্শে স-হইতে গণনা করিয়া র্স-পর্য্যন্ত শ্রুতি স্থাপন করা হইয়াছে।

রাগ-বিবোধের মতে ৭টি বিকৃত স্বর। যথা:—গ, সা-গ, অ-গ, ম, ন, কৈ-ন, কা-ন।]

আকারমাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

১। স র গ ম প ধ ন=সপ্তক। খাদ সপ্তকের চিহ্ন—সুরের নীচে হসন্ত, এবং উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন—সুরের মাথায় রেফ্।

২। কোমল র=ঋ; কোমল গ=জ্ঞ; কড়ি ম=হ্ম; কোমল ধ=দ; কোমল ন=ণ।

৩। তাল বিভাগের চিহ্ন, পার্শ্বে এক-একটী দাঁড়ি। ১, ২´, ৩, ০ ইত্যাদি তালি ও ফাঁকের অঙ্ক। যে অঙ্কের মাথায় রেফ্ তাহাই সম্।

৪। তালের এককেরা হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে "আই" এই ইংরাজী অক্ষরটী বসে; আরম্ভ ও শেষে দুই "আই" বসে।

৫। একমাত্রা=।। অর্দ্ধমাত্রা=ঃ। দুইটী অর্দ্ধমাত্রা, যথা 'সরা'। চারিটী সিকিমাত্রা, যথা "সরগমা"। দুইটী সিকিমাত্রা, যথা সরঃ। একটী অর্দ্ধমাত্রা ও দুইটী সিকিমাত্রা মিলিয়া একমাত্রা, যথা সঃ গরঃ। একটী দেড়মাত্রা ও একটী অর্দ্ধমাত্রা মিলিয়া দুই মাত্রা, যথা রাঃ গঃ।

৬। কোন আসল সুরের পূর্ব্বে যদি কোন নিমেষকালস্থায়ী আনুষঙ্গিক সুর একটু ছুঁইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেই সুরটী ক্ষুদ্র অক্ষরে আসল সুরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়, সগা—গরা। গমকের স্থলে প্রায়ই এইরূপ স্পর্শমাত্রিক সুর লাগিয়া থাকে। আসল সুরের পরে কখন কখন অন্য সুরের ঈষৎ রেশ লাগে; তখন ঐ সুর ক্ষুদ্র অক্ষরে দক্ষিণপার্শ্বে লিখিত হয়, যথা রাস।

৭। বিরামের চিহ্ন ও মাত্রাসমূহের চিহ্ন একই; হাইফেন্-বর্জ্জিত হইলে, এবং স্বরাক্ষরের গায়ে সংলগ্ন না থাকিলেই সেই মাত্রা বিরামের মাত্রা বলিয়া জানিবে। সুরের ক্ষণিক নিস্তব্ধতাকে বিরাম বলে।

৮। অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি। হয় এইখানে একেবারে থামিবে; নয় এইখানে থামিয়া গানের অন্য কলি ধরিবে।

৯। পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ আস্থায়ীতে প্রত্যাবর্ত্তনের চিহ্নস্বরূপ দুইটি করিয়া "আই" বসে। কোন কলির শেষে II এই যুগল "আই" দেখিলেই আস্থায়ীর যেখানে এইরূপ যুগল "আই" আছে সেইখান হইতে আবার আরম্ভ করিবে।

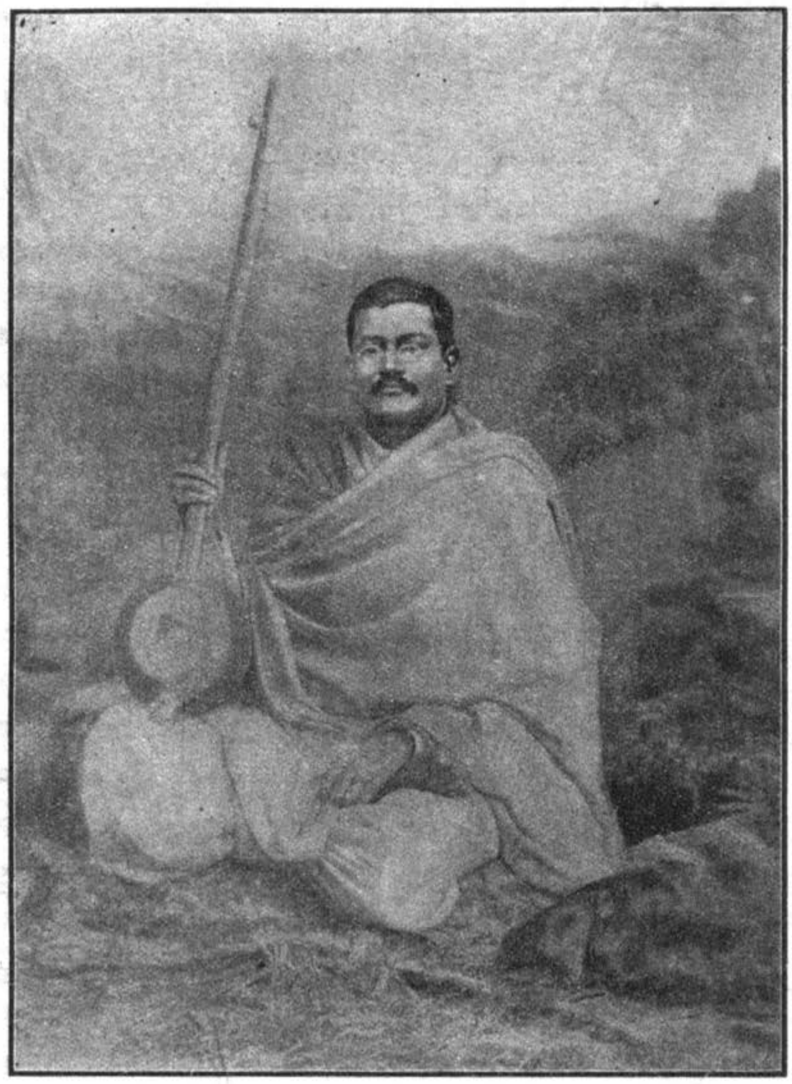
১০। পৌনরুক্তির চিহ্ন, এই { } গুম্ফ বন্ধনী; এবং পৌনরুক্তিকালে কতকগুলি সুর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন, এই ( ) বক্র বন্ধনী, যথা { সা রা গা (মা পা) ধা না }

১১। পুনরাবৃত্তি ও পৌনরুক্তিকালে কোন সুরের পরিবর্ত্তন হইলে, শিরোদেশে ব্রাকেটের মধ্যে পরিবর্ত্তিত সুরগুলি স্থাপিত হয়। যথা,—সা রা গা। [রা গা মা]

পঞ্চনবতিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ সোমবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় মহর্ষি-দেবের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।



ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

একমেবাদ্বিতীয়ং
একবিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
মাঘ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৬।
৯৯০ সংখ্যা ১৮৪৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিগতাব্দ ৫০২৬। সম্বৎ ১৯৮২। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৭। সাল ১৩৩২।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৭০। অঞ্জলি—জ্যোতিঃস্বরূপ দেবতা।

১। তুমি দীপ্যমান পরমেশ্বর। তোমারই জ্যোতিতে সূর্য্য জ্যোতিষ্মান হইয়াছে। তোমারই জ্যোতির কণামাত্র লাভ করিয়া আকাশে অগণিত গ্রহনক্ষত্র নিজ নিজ জ্যোতিতে প্রকাশ পাইতেছে। তোমারই জ্ঞানজ্যোতির কণামাত্র পাইয়া মানবাত্মা ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষে বিচরণ করে। তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তুমি প্রত্যেক মানবের অন্তর ও বাহির সমস্তই জানিতেছ।

২। হে স্বপ্রকাশ! তুমি যখন আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হও, তখন তোমার তেজোময় স্বপ্রকাশ মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের রিপুগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, এবং সূর্য্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার পলায়ন করে, সেইরূপ তাহারা তস্করের ন্যায় পলায়ন করে।

৩। সূর্য্যরশ্মি অন্ধকার গুহাতে প্রবেশ করিলে যেমন তাহার অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক পদার্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় তুমি আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক ভাব দেখিতেছ।

৪। হে পরমেশ্বর! তুমি সর্ব্বব্যাপী। তুমি বিশ্বজগতকে আদ্যন্ত মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার এক মুহূর্ত্ত দর্শন লাভের জন্য জগতবাসী আকুল নয়নে তোমার দিকে চাহিয়া আছে। তুমিই জ্যোতির জ্যোতি পরমজ্যোতি। জগতে যাহা কিছু জ্যোতির্ম্ময় দেখি, এ সমস্তই তোমারই জ্যোতির কণামাত্রে উদ্ভাসিত। তোমারই জ্যোতি ভূলোকে, তোমারই জ্যোতি দ্যুলোকে ও অন্তরীক্ষে।

৫। দেবলোকে যেমন দেবতারা তোমাকে ঘিরিয়া তোমার স্তুতি-গীতসকল গান করে, ভূলোকে তেমনি মনুষ্যেরাও তোমারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমারই স্তুতি গান করে। তুমি দয়া করিয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া অধিষ্ঠান কর।

৬। হে করুণাময় পরমেশ্বর! তোমার কৃপাবারি দ্বারা আমাদের সকল পাপ, সকল তাপ বিধৌত কর। আমাদের সকল কলুষ মার্জ্জনা কর। তোমার স্নেহপ্রেমে বিশ্বজগতকে পোষণ করিতেছ। তুমি আমাদেরও উপর তোমার স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ কর, আমরাও তেজে বীর্য্যে পরিপুষ্ট হই।

৭। তোমারই শাসনে অসীম আকাশে অগণিত সূর্য্যচন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তোমারই শাসনে অন্তরীক্ষে অগণিত গ্রহনক্ষত্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তুমি দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ, সকল লোকে স্বীয় তেজে পরিভ্রমণ করিয়া তোমার শাসন অপ্রতিহত রাখিয়াছ।

৮। হে স্বপ্রকাশ! তুমি সহস্র সূর্য্যের জ্যোতি ধারণ কর। তুমি যেমন তোমার জ্যোতি দ্বারা নিজেকেও প্রকাশ কর, তেমনি তোমারই জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া জগতের বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতম পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদার্থই আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। তোমার পদ নাই, কিন্তু তুমি বায়ু হইতেও বেগবান। সপ্তাশ্ব সূর্য্য অমিত বেগে চলিয়াও তোমাকে ধরিতে পারে না।

৯। তুমিই আমাদের পিতা, তুমিই আমাদের বৃদ্ধ পিতামহ। তোমার জ্যোতির্ম্ময় শুক্ল কেশের তেজ আমাদের নয়ন ধারণ করিতে গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। আমরা তোমাকে ডাকিবার মত ডাকিতে না পারিলেও তুমি তোমার তেজের বর্ম্মদুর্গে আমাদিগকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছ। বিপদ-আপদ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

১০। আমাদের অন্তরে তুমি যে জ্ঞানজ্যোতি নিহিত করিয়া দিয়াছ, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা যেমন সূর্য্যের অন্তরে প্রবেশ করি, তেমনি আমরা এই চক্ষের অগোচর সূক্ষ্মতম পরমাণুরও অন্তরে প্রবেশ করি।

১১। হে দীপ্যমান পরমেশ্বর! তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তুমি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে বাহিরে সকলই সুস্পষ্ট দেখিতেছ। তুমি অনাথের নাথ, তুমি দুর্ব্বলের বল। আমরা সহায়হীন। তুমি আমাদের সহায় হও। সংসারের দুঃখ-কষ্টে আমাদের শরীর ও মন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বিপদ আপদের ভয়ে আমাদের হৃদয় সর্ব্বদাই কাঁপিয়া উঠে। রোগেশোকে আমাদের হৃদ্‌রোগ জন্মিয়াছে এবং আমাদের দেহ শুকাইয়া পাংশুল হইয়া যাইতেছে। তুমি চিকিৎসকের মূর্ত্তিতে আসিয়া আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার রোগ হইতে নির্ম্মুক্ত কর এবং অপরকে রোগনির্ম্মুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান কর। আমরা নিজেরাও যেন আধিব্যাধি হইতে মুক্ত হই এবং জগতবাসীকেও যেন আধিব্যাধি হইতে মুক্তিদানের ক্ষমতা ধারণ করি।

১২। আমাদের দ্বেষহিংসা, পাপতাপের কারণেই আধিব্যাধির কবলে পড়িয়াছি। আমাদের দ্বেষহিংসা পাপতাপ সমস্তই আজ তোমার চরণে নিবেদন করিয়া দিতেছি। তুমি সেই দ্বেষহিংসা ও পাপতাপ হরণ করিয়া লও এবং সেই সঙ্গে আধিব্যাধিও হরণ কর। আমার দেহ সবল হউক, মন সতেজ হউক এবং মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আত্মা স্বীয় তেজে প্রকাশিত হউক।

১৩। সূর্য্য যেমন নিজ তেজে সকল রোগের বীজ বিনষ্ট করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে যে তেজের অধিকারী করিয়াছ, আমরাও যেন সেই তেজের দ্বারা আমাদের সকল আধিব্যাধি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারি। হে ভগবান! তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, যদি কাহারও কার্য্য বা বাক্যের দ্বারা আমাদের মন ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হইয়া উঠে, তবে আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের হৃদয় যেন তাহার প্রতি দ্বেষহিংসা পোষণ না করে।

১৪। অঞ্জলি—বিশ্বভর্ত্তা দেবতা।

১। তুমি আমাদের সকলের বরণীয়। আমরা তোমাকে ভজনা করি। তুমিই একমাত্র সকল ঐশ্বর্য্যের মূল। আমরা তোমাকে নমস্কার করি। তোমারই শাসনে সূর্য্যচন্দ্র ও অগণিত জ্যোতিষ্ক আমাদের হিতসাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। আমাদের প্রীতিভক্তি তোমাকে নিবেদন করিতেছি। তুমি তাহা স্নেহহস্তে গ্রহণ কর।

২। তোমারই সৌন্দর্য্যে এই ধরণী সুশোভন সাজে সজ্জিত হইয়াছে। তোমারই তেজে অন্তরীক্ষ রোমাঞ্চিত। তোমার শক্তি অপ্রতিহত। তুমিই সকলের গর্ব্বগঞ্জন। তুমিই জগতে কর্ম্ম-যজ্ঞের প্রবর্ত্তক। তুমি আমাদের সহায় হও এবং তোমার অভয়বাণী শুনাইয়া আমাদিগকে নির্ভয় কর। আমরা যেন তোমার কর্ম্মসাধনে সর্ব্বদাই অগ্রণী হই।

২। তোমারই ভয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে। তোমারই ভয়ে মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। তুমিই আমাদের অন্তরে রিপুদমনের বুদ্ধি নিহিত করিয়া দিয়াছ। তুমিই আমাদের পিতৃপিতামহগণকে ধনধান্যে প্রচুর ঐশ্বর্য্যবান করিয়াছিলে এবং তুমিই তোমার বজ্রের দ্বারা তাঁহাদের সমুদয় বিপদ-আপদ ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিলে।

৪। তোমারই ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। তোমারই ভয়ে বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে। তোমারই আদেশে ধরণীর গর্ভে ধনরত্নের অফুরন্ত

ভাণ্ডার নিহিত রহিয়াছে। যাহারা আমাদের প্রতি হিংসা করে এবং আমাদের বিনাশসাধনে উদ্যত, তুমিই তাহাদিগকে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দাও। তুমিই আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর, যাহাতে আমরা আমাদের শত্রু ও বন্ধু বাছিয়া লইয়া শত্রুদিগকে পরিহার করিতে পারি এবং বন্ধুদিগকে গ্রহণ করিতে পারি।

৫। আমাদের শত্রুগণের কার্য্যফলে আমাদের প্রাপ্য অন্ন আমরা পাইতেছি না। হে অন্নদাতা, হে বলদাতা! তুমি আমাদের প্রাপ্য অন্ন আমাদিগকে প্রদান করিয়া আমাদের বলবিধানে সহায়তা কর। হে রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। তুমি আমাদের শত্রুগণকে বিধ্বস্ত কর। আমরা একমাত্র তোমাকেই ভজনা করি। তুমি আমাদিগকে বিনাশ করিও না। তোমার সঞ্জীবনী শক্তিতে আমাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিও।

৬। অধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্ম যখন পরাভূত হইবার উপক্রম করে, তখন তুমি তোমার রুদ্রমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া অধর্ম্মকে বিধ্বস্ত কর এবং তোমার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মূর্ত্তিতে সাধুদিগের রক্ষার জন্য সত্যধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত কর।

৭। তোমার বল অপ্রতিহত। তোমার ইচ্ছা ও শক্তির বিরুদ্ধে কেহই দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের প্রতি তোমার স্নেহপ্রেম অসীম। তুমি একহস্তে বজ্র দণ্ড ধারণ করিয়া শত্রুগণের ভীতি উৎপাদন করিতেছ এবং অপর হস্তে তোমার অভয় বর ধারণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছ।

৮। তুমি সকলের প্রভু। তুমিই পরম মহেশ্বর। তুমিই একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ। তুমি আমাদের অন্তর ও বাহির সকলই জানিতেছ। যাহারা সংশয়াত্মা এবং তোমার প্রতি অশ্রদ্ধাবান, তাহাদের সংশয় দূর করিয়া তাহাদিগকে তোমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত কর। আমাদের অন্তরে এমন জ্ঞান প্রেরণ কর, যাহাতে আমরা সেই জ্ঞানজ্যোতি দ্বারা সেই সংশয়াত্মাদিগের চিত্ত আলোকিত করিয়া তাহাদের সংশয়-অন্ধকার বিনষ্ট করিতে পারি। আমাদের অন্তরে এমন প্রেমের বন্যা আনয়ন কর, যাহাতে আমরাও তোমার নামকীর্ত্তন করিয়া তাহাদের অন্তরে প্রেমের বন্যা বহাইতে পারি।

৯। আমাদের অন্তরে যদি তোমার প্রতি একটুও সংশয় স্থান পায়, তবে তুমি তাহা তোমার প্রেমের অগ্নিতে ভস্মীভূত কর এবং আমাদিগকে সর্ব্বদাই তোমারই চরণতলে থাকিবার অধিকার দিও। ইহলোকে এবং পরলোকে আমরা যেন তোমারই আশ্রয় লাভ করি।

১০। হে পরমেশ্বর! আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি তোমার প্রেমে মিলিত হইয়া দ্যুলোক ও ভূলোক ভাসাইয়া দিক। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মে তোমার আসন যেন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে।

১১। আমরা বিপদে পরিবৃত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি। আমাদের শরীর-মন দুঃখ-কষ্টের তাপে দগ্ধ ও জীর্ণ হইতেছে। তুমি তোমার শান্তিধারা বর্ষণ করিয়া আমাদিগের দুঃখ-কষ্ট দূর কর এবং আমাদের শরীরমন শীতল কর। শত্রুগণ আমাদের চতুর্দ্দিকে শান্তিজলের প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তুমি তাহাদের রচিত সুবৃহৎ বাঁধ বিচূর্ণ করিয়া দাও।

১২। হে পরমেশ্বর! আমাদের প্রীতি-অর্ঘ্য গ্রহণের জন্য তুমি আমাদের গৃহে আগমন করিয়াছ। আমরা কায়মনোবাক্যে তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনের দ্বারা তোমার পূজা করিতেছি। আমাদিগকে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পদ লাভের অধিকার প্রদান কর।

১৩। তুমি আমাদিগকে এমন সুন্দরী সহধর্ম্মিণী প্রদান কর, যাঁহারা আমাদের সহিত একহৃদয়ে মিলিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনে সহায়তা করেন। পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমরা যেন গার্হস্থ্যধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিতে পারি, এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রদান কর।

১৪। তুমি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। তুমি সত্যস্বরূপ, তুমি ঋতস্বরূপ। তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। তোমার বিধানসকল তোমারই মঙ্গলময় ন্যায়বিধানে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তোমার মঙ্গলবিধান কে বিচলিত করিবে? আমাদের

অন্তরে এমন শক্তি ও ইচ্ছা দাও, যাহাতে আমরা ন্যায়ের পথে ধর্ম্মের পথে সকল অবস্থাতেই অবিচলিত থাকি। আমাদিগের গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ কর, যাহাতে দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে পারি, রোগীর আরোগ্য লাভের ব্যবস্থা করিতে পারি এবং পাপীর অশ্রুজল মুছাইয়া শান্তি দিতে পারি।

১৫। হে সকল দেবতার পরমদেবতা! তুমি তোমার অমিত তেজ ক্ষণেকের জন্য সংহরণ করিয়া আমাদের অন্তরে শান্তিধারা বর্ষণ কর। তোমার স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলের কার্য্য বর্ণনা করিতে গিয়া মন ও বাক্য প্রতিনিবৃত্ত হয়। তুমি মহান, তুমি অনাদি পরম পুরুষ। আমরা তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আমাদের গৃহ তোমার প্রতি ভক্তিমান সন্তানগণের দ্বারা পূর্ণ কর। আমাদের পুত্র-পৌত্রাদিকে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে সমুজ্জ্বল কর এবং শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠাতাগণের মধ্যে বরিষ্ঠ কর।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও স্বাধীনতা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে সরল, সবল ও উদার আশাবাণী আমরা শুনিয়া আসিয়াছি, তাহাই আজ ঋষিবাক্যে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি—

"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" এই আকাশে যে এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সকলই জানিতেছেন; এই আত্মাতে যে এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সকলই জানিতেছেন, সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

মুক্তির অর্থে আমি স্বাধীনতা বুঝি। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পাপ-তাপ দুঃখ-দারিদ্র্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভেরই অর্থ হইল প্রকৃত স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়া ভগবান আমাদিগকে তাঁহার সহিত সমধর্ম্মী করিয়া গড়িয়াছেন বলিয়া স্বাধীনতালাভের জন্য আমাদের অন্তরে এত প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত। স্বাধীনতা ব্যতীত মানুষ বাঁচিতেই পারে না। তাই পরাধীনতা আমাদিগকে যতই ঘিরিতে চায়, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ততই প্রবল বেগে আমাদিগকে মুক্তির পথে ঠেলিয়া পাঠায়।

কিন্তু স্বাধীনতালাভের কেবল আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই চলিবে না। সেই মৃত্যুর অতীত অমৃত পুরুষ ভগবানকে না জানিলে মুক্তিলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই। মুক্তি পাইতে চাহিলে তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখিতে হইবে। এই স্বাধীনতার মূল প্রাণ হইল ভগবানের সহিত মানবের প্রত্যক্ষ যোগসাধন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করিলে, ভগবানকে সাক্ষাৎ পিতামাতা সখাসুহৃৎ জানিয়া তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধন করিতেই হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক পরাধীনতায় প্রকৃত সত্যধর্ম্ম আচ্ছাদিত হইবার ফলে মধ্যবর্ত্তীবাদ, গুরুবাদ, অথবা পৌরোহিত্য ধর্ম্মের আড়ম্বর প্রভৃতি মানুষের মনুষ্যত্বকে একেবারে শুকাইয়া দিতেছিল। অবশেষে "মনুষ্যমাত্রেরই আত্মাতে ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গলভাব অবিনশ্বর অক্ষরে নিহিত আছে", ব্রাহ্মধর্ম্ম এই চিরন্তন মহান সত্য ঘোষণা করিয়া নিজের অসাম্প্রদায়িকতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার পরাধীনতার কঠোর নিগড় কাটিয়া দিবারও পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। বর্ত্তমানে ব্রহ্মোপাসক আমরা এই স্বাধীনতার ভিতর এতই লালিত পালিত যে, এই স্বাধীনতার পথ খুলিয়া দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের যে কি উপকার করিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব এখন আমরা উপলব্ধি করিতেই পারি না; বরঞ্চ আধ্যাত্মিক পরাধীনতার কথা শুনিলেই এখন আমরা চমকিয়া উঠি।

আধ্যাত্মিক পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরাধীনতাও বিদূরিত হইতে লাগিল। বেদবেদান্ত প্রভৃতি স্ত্রীশূদ্রাদির অনধিগম্য থাকিবার কারণে, যে অজ্ঞান দেশকে অন্ধকারে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, ব্রাহ্মধর্ম্মের উজ্জ্বল কিরণসম্পাতে তাহা বিদূরিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণা করিলেন যে, মানবমাত্রেরই অন্তরে নিহিত ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিবার পক্ষে যাহা কিছু সহায়তা করিবে,

কোন নরনারীকে তাহা হইতে ঠেলিয়া রাখিবার অধিকার কাহারও নাই।

আধ্যাত্মিক ও মানসিক পরাধীনতা অপসৃত হওয়াতেই আমরা এখন বুঝিতেছি যে, শরীর-সংস্থানবিষয়ক পরাধীনতা আমাদিগকে কতটা আটেঘাটে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে, "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং" —পরবশ যাহা কিছু সমস্তই দুঃখের কারণ এবং আত্মবশ যাহা কিছু তাহাই সুখের কারণ। এবং সেই কারণেই ব্রাহ্মধর্ম্ম এমনটা চিরনির্দ্দিষ্ট করিয়া বলেন না যে, দেশ-কাল-অবস্থা-নির্ব্বিশেষে এইটী বা ঐটীই ভক্ষ্য বা অভক্ষ্য, এইটী বা ঐটীই পরিধেয় বা অপরিধেয়; এই বা ঐ সামাজিক অনুষ্ঠানটী অনুষ্ঠেয় বা অননুষ্ঠেয়; এই রাজা বা ঐ রাজা সম্ভজনীয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধন প্রভৃতি অবলম্বনে তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধনকেই মূল লক্ষ্যরূপে স্থির রাখিয়া বলেন যে, যে ভাবে শরীরসংস্থানের চেষ্টা করিলে, যে ভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বাহিরের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলে ভগবানের অপ্রিয় হইবে না, প্রত্যুত তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধনের সহায়তা করিবে, সেই ভাবেই জীবনের সমস্ত ব্যবহার, আহারবিহার নিয়মিত করিতে হইবে। দেশ-কাল-অবস্থার বিভিন্নতা অনুসারে জ্ঞানার্জ্জনের পদ্ধতির ন্যায় আহারবিহারের পদ্ধতি, শরীরসংস্থানের চেষ্টা, সামাজিক বা রাজনৈতিক মতামত বিভিন্ন হইতে পারে। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্য সকল বিষয়ে মানবকে যথাযুক্ত স্বাধীনতা দিয়া কেবল ভগবানকেই জীবনের কেন্দ্র করিবার উপদেশ দেন। এই কারণেই ব্রাহ্মধর্ম্মের দেবতাও যেমন একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, তেমনই তাহার বীজমন্ত্রও একটী মাত্র—'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব'—তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনই তাঁহার উপাসনা। এই মূলমন্ত্র অপেক্ষা অন্য কোন ধর্ম্মেরই মূলমন্ত্র অধিকতর সরল ও সবল হইতে পারে না। এই মূলমন্ত্রে দার্শনিকতার মারপেঁচ নাই, সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন নাই, আর বিভিন্ন মতামতের বাদবিসম্বাদেরও সমাবেশ নাই।

এই অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম অধ্যাত্মধর্ম্ম। ইহার মূল কেন্দ্র দুইটী—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। তাই কোন শাস্ত্রমাত্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে না। আত্মা কেবল যে এদেশবাসীরই আছে, অপর দেশবাসীর নাই তাহা নয়; পরমাত্মা যে কেবল এদেশবাসীরই পিতামাতা, অপর দেশবাসীর নয়, এমনও কোন কথা নাই। যখন প্রত্যেক মানবেরই আত্মা আছে এবং পরমাত্মাও যখন প্রতি আত্মাতে আত্মার অন্তরাত্মারূপে অবস্থিত আছেন, তখন কোন জাতিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের প্রণীত কোনও শাস্ত্রগ্রন্থই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনন্য ভিত্তি হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি মর্ত্ত্য মানবের কপোলকল্পিত শাস্ত্রাদি অপেক্ষা সুদৃঢ় —ঈশ্বরের রচিত কোটি কোটি লোকপরিপূর্ণ মস্তকের উপরিস্থ এই অসীম মুক্ত আকাশ এবং দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ অনন্ত উন্নতিশীল এই অবিনশ্বর মানবাত্মা। পরমাত্মার সহিত মানবের অতি মধুর সম্পর্ক। তিনি পিতা, আমরা পুত্র; তিনি আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের মঙ্গলবিধাতা। তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে আত্মা মধুময় হয়, বিশ্বজগত মধুময় হয়; ঈশ্বরের মঙ্গলকিরণে জগতসংসার উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ঈশ্বরকে আত্মস্থ দেখিলে হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ভগ্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, মৃত্যু বিভীষিকা দেখাইতে পারে না।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কোনপ্রকার অতিপ্রাকৃত ধর্ম্ম নহে। ইহা এত সহজ ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে, অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ন্যায় ইহাতে অতিপ্রাকৃত কোন কিছু দেখাইয়া লোকসংগ্রহের প্রয়োজনই অনুভূত হয় না—অবসরই নাই। কিন্তু এই দরিদ্র দেশের অধিবাসী আমরা নানা কারণে শত শত বৎসরের সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতার মধ্যে বাস করিতে করিতে শরীরে মনে এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের অনেকে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মুক্তভাব উপলব্ধি করিতেই পারেন নাই; আমাদের প্রাণের উপর হইতে অসাড়তার আবরণ এখনও সম্পূর্ণ অপসৃত হয় নাই। তাই আমাদের দেশে এখনও দেখা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা দেখাইতে

পারিলেন, অমনি তাঁহাকে ভগবান-বোধে আমরা পূজা করিতে প্রবৃত্ত হই। ভাবি না যে, জগতে আমার কাছে কোন কিছু অতিপ্রাকৃত বোধ হইলেও সমস্তই প্রাকৃত—আসলে অতিপ্রাকৃত বলিয়া কিছুই নাই।

আমরা ভুলিয়া যাই যে, ভগবান কোন এক ব্যক্তিতে, কোন এক জাতিতে অথবা কোন এক দেশে বা কোন এক কালে আবদ্ধ নন। তিনি প্রতি অনু পরমাণুতে স্বপ্রকাশ। আমরা ভুলিয়া যাই যে, এই প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনি এবং যিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মার আত্মারূপে রহিয়াছেন, তিনি আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা। প্রাণের ইচ্ছা লইয়া সরল পথে যদি তাঁহার নিকটে যাই, তবে সকল বাধাই অতিক্রম করিতে পারি। এই সোজা কথা আমরা ভুলিয়া যাই বলিয়াই সময়ে সময়ে আমরা এ-মহাপুরুষকে সে-মহাপুরুষকে অতিপ্রাকৃত ভাবিয়া ভগবানের সিংহাসনে বসাইতে উদ্যত হই। ভাবিয়া দেখি না যে, কোন মানুষই অতিপ্রাকৃত পূর্ণ অবতাররূপে ভগবানের সিংহাসনে বসিবার যোগ্য নন। ব্রহ্মোপাসকের উপাস্য দেবতা পরব্রহ্ম অনন্তস্বরূপ, অপ্রতিম ও অদ্বিতীয়। মনুষ্য জ্ঞানে ধর্ম্মে যতই কেন উন্নত হউন না, ব্রহ্মোপাসক তাঁহার চরণে শতবার মস্তক অবনত করিলেও তাঁহাকে পরব্রহ্মের সহিত একাসনে কিছুতেই বসাইতে পারেন না। যাঁহাকেই আমরা ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার বলিয়া স্বীকার করিতে উদ্যত হইব, তিনিই তো অন্তত স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ হইবেনই। ক্ষুদ্রতম অনু পরমাণু অবধি শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ পর্য্যন্ত সকলকেই তাঁহার আংশিক শক্তি লইয়া অবতীর্ণ বলিতে পারি। কিন্তু আমরা কল্পনাই করিতে পারি না যে, কোনও মনুষ্য অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরের পূর্ণ অবতার কিরূপে হইতে পারেন? ইহা সহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্য যে, প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কোন কিছুই অতিপ্রাকৃত বা প্রকৃতির অতীত হইতে পারে না। উদারপ্রাণ মহাপুরুষদিগকে আমরা শতবার ধর্ম্মসংস্থাপনের যুদ্ধে, স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতা বলিয়া অনুসরণ করিতে পারি; কিন্তু সৃষ্ট বস্তুকে পরব্রহ্মের সিংহাসনে বসাইয়া পরব্রহ্মের প্রাপ্য ভক্তিপ্রীতির নৈবেদ্য কিরূপে অর্পিত হয়, আমরা প্রকৃতই তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ভগবান ও মানবের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী অভ্রান্ত গুরু বলিয়া কোন কিছু দাঁড়াইতে পারে না। ভগবানই আমাদের একমাত্র মধ্যবর্ত্তী ও অভ্রান্ত গুরু। তাঁহাকে আত্মাতে উপলব্ধি করিলে, তাঁহার বাণী অন্তরে শুনিলে অপর কোন কিছুকেই মধ্যবর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজনই হইবে না।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক বলিয়াই ইহা মিলনের ভিত্তিভূমি হইবারও অধিকার রাখে। এই সত্যধর্ম্ম এক ও অভিন্ন বলিয়া, ইহার অভিব্যক্তির সঙ্গে মিলনেরও ভাব অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান যুগে আমরা আর সে শতধাবিভক্তের বিভাগ দেখিতে চাই না। আমরা চাই মিলন—একতা। আমরা চাই, সকলেরই হৃদয়ে একই ভাব ঝঙ্কার দিয়া উঠুক। সকল ধর্ম্মের ভিতর যে সার ধর্ম্ম, তাহাই এখন আমরা রাখিতে চাই; এবং সেই সার ধর্ম্মকেই বিজ্ঞান, সমাজ প্রভৃতি মানবের কর্ম্মক্ষেত্রের সকল বিভাগের ভিতর দিয়াই প্রচার করিতে চাই।

সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার উৎস, আমাদের জীবনে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা দিতে সক্ষম এবং আমাদের মিলনের ভিত্তিভূমি এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি আমরা গ্রহণ না করি, আমাদের জীবনের নিয়ামক না করি এবং সেই কারণে যদি আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জনে ও উন্নতিলাভে অক্ষম হই, তবে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের দোষ নয়, তাহা আমাদেরই আলস্যের দোষ, আমাদের অবহেলার ফল। এইরূপ উপেক্ষার ফলেই আজ আমরা আলস্যকে সম্বল করিয়া ব্রহ্মোপাসনার অনাবশ্যকতা প্রচার করি! কিন্তু নিশ্চিত জানিও, ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও উন্নতি অর্জ্জনের জন্য যে জ্ঞানের আলোচনা চাই, যে ভক্তিপ্রীতির আয়োজন চাই, যে শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান চাই, সেই সকল আয়ত্ত করিতে পশ্চাৎপদ হইবার কারণেই আজ আমরা লাঞ্ছনা, অত্যাচার ও অবজ্ঞার কঠোর আঘাত সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মোপাসকেরা কি জ্ঞানে, কি বিদ্যায়,

কি ধর্ম্মে, কি অর্থে, সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। কোন ব্যক্তি বা জাতি, কোন দেশ বা সমাজ আলস্য ও নিশ্চেষ্টতার মোহমদিরা পান করিয়া, সুখসোয়াস্তির প্রাণশোষক আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকিয়া জীবন লাভ করে নাই, স্বাধীনতার ও উন্নতির পথে যাত্রা করিবার অধিকার লাভ করে নাই, মুক্তির অমৃতসুখ অনুভব করে নাই। দেশকে স্বাধীনতার পথে, উন্নতির পথে দাঁড় করাইতে গেলে পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় শত নিগ্রহের ভয় সত্ত্বেও তাহা উপেক্ষা করিয়া, তাহার অতীত হইয়া আমাদিগকে ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে এবং তাহারই মুক্তিবাণী একনিষ্ঠ হৃদয়ে প্রচার করিতে হইবে। সমগ্র ভারতের অধিবাসীগণ যখন এই অবিনশ্বর সত্যধর্ম্ম অবলম্বনের ফলে একহৃদয় হইয়া উঠিবে, তখন সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন অবান্তর বিষয়ে একতার জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তিপ্রদ স্বাধীনতার সত্য আশ্বাসবাণী প্রচার করিবার এক মহান অবসর আসিয়াছে। একদিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার, অপর দিকে আমাদের জীবনের ও ধর্ম্মের সমুন্নত আদর্শের অভিব্যক্তি—ইহারই অপরিহার্য্য পরিণামে জনসমাজে এক মহাজাগরণ উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন বল, আর নবীন বল, কোন পন্থারই শুষ্ক মতামত ও শুষ্ক অনুষ্ঠানের বাঁধনে বর্ত্তমান যুগের মানুষ আপনাকে আপনি বাঁধিয়া রাখিতে চায় না; অন্ধ কুসংস্কারের দাস হইতে চায় না, মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে চায় না; অন্তরের সমুন্নত ভাবগুলিকে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে চায় না। বর্ত্তমান যুগে মানুষ প্রাণের ভিতর একটা সরল ও সবল ধর্ম্মের অভাব অনুভব করিতেছে। সকলেরই অন্তরে এমন এক সত্যধর্ম্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতে পারে যে, যে দেবতা এই অসীম আকাশে থাকিয়া প্রকৃতির প্রত্যেক ঘটনাকে নিয়মিত করিতেছেন; যে দেবতা মানবের আত্মাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মানবসমাজকে দেবত্বে উন্নীত করিতেছেন, তিনি আমাদের পিতামাতা, তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ ও মঙ্গলের আকর, তিনি আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও উন্নতির মূল। আমরা এখন এমন সরল ও সবল ধর্ম্ম চাই, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে অসন্দিগ্ধ ভাষায় বলিতে পারে যে, যে মত, যে শাস্ত্র ভগবানের সঙ্গে মানবের প্রত্যক্ষ যোগের পথে অর্গলরূপে দাঁড়াইবে, সেই মত, সেই শাস্ত্র অবিলম্বে পরিত্যাজ্য। আমরা এমন ধর্ম্ম চাই, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে বলিবার অধিকার রাখে যে, কেবল কথার বলে, মেধার বলে বা পুঁথিগত বিদ্যার বলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না; সত্যপথের প্রত্যেক পথিক শুভকার্য্যের দ্বারা পবিত্রতা দ্বারা তাঁহার স্পর্শ লাভ করিতে পারে। আমার বিশ্বাস —ব্রাহ্মধর্ম্মই এই সরল ও সবল সত্যধর্ম্ম। যে ব্রাহ্মধর্ম্মের কেন্দ্র ভগবান; যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র —ভগবানকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিয়াই মানুষকে ভাই বলিয়া প্রাণের ভিতর ডাকিয়া লওয়া; আমরা খুব দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মই বর্ত্তমান যুগের সরল ও সবল ধর্ম্মের জন্য প্রাণের এই গভীর আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিবে না।

সত্যধর্ম্মকে ছাড়িয়া আজ বহুদিন যাবৎ আমরা স্বার্থের চরণে, অযথা পৌরোহিত্যের চরণে, উপধর্ম্মের চরণে যে দাসত্বের খত লিখিয়া দিয়া বসিয়া আছি, আজ সময় আসিয়াছে—সেই দাসত্বের খত ফিরাইয়া লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবার; এখন আমাদের মুক্তিলাভের সময় আসিয়াছে। আর স্বাধীন মানবাত্মাকে সর্ব্বাঙ্গীন দাসত্বের নিম্নে ফেলিয়া তাহাকে নির্জীব হইতে দিও না। অযথা বন্ধন যাহা কিছু, সমস্তই ভাঙ্গিয়া ফেল; স্বাধীনতার মুক্তবায়ুতে বিচরণ করিয়া ক্ষয়রোগের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অন্তত একবার উদ্যোগ ও চেষ্টা কর। যে অপরাজিত পরম পুরুষের শক্তিবলে আমাদের আত্মা ত্রিভুবনবিজয়ের শক্তি ধারণ করে, নির্ভয়ে তাঁহার সেই পতাকাতলে সমবেত হও। প্রাণের অন্তরে সেই মহাসত্যের বিমলজ্যোতি প্রবেশ করিতে দাও। জ্ঞানে বড় হও, ধর্ম্মে বড় হও, কর্ম্মে বড় হও। যাঁহার মঙ্গল

ইচ্ছা ও শক্তি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত, তিনিই আমাদের পিতামাতা, তিনিই আমাদের নেতা। অধর্ম্মের সহিত সংগ্রামে যদি জয়লাভ করিতে চাও, সন্তান-সন্ততির যদি প্রকৃত উন্নতি দেখিবার আশা কর, তবে সেই ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, সত্যেতে একনিষ্ঠ হইয়া, তাঁহার প্রতি হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি সন্ন্যস্ত কর, ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রকৃত সত্য-ধর্ম্ম জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রচারে যত্নবান হও। যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশাবাণী শুনিয়া নির্ভয়ে স্বাধীনতার পথে চলিতে শিখিয়াছি, ভগবানকে অন্তর্যামী সাক্ষাৎ পিতামাতা বলিয়া জানিয়াছি, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র—ভগবানকেই প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা—এই বীজমন্ত্র প্রাণের ভিতর বরণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে জয়যুক্ত কর; এবং ব্রাহ্ম-সমাজকে নবীন ভাবে নবীন আলোকে আলোকিত কর। অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের পূজা করিয়া কৃতার্থ হও এবং তাঁহারই নামের জয়ঘোষণা কর। সংশয় ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর ও জাগ্রত হও।

সব ভাই এক ঠাঁই।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ছিঁড়ে দে রে দাসপাশ
ভেঙে ফেল্ শৃংখল
অধীনতা সুখরাশ
করে দে রসাতল।
সবে মিলে বল্ বল্
"ভারতের সন্তান
মোরা সব একই দল
একমন একপ্রাণ।"
ভেদাভেদ যাক্ ঘুচে
ঘুচে যাক্ দ্বন্দ্ব
কলহও যাক্ মুছে
দূর হোক্ মন্দ।
রাখ্ মনে রাখ্ তাই
আমাদের মন্ত্র—
"সব ভাই এক ঠাঁই
নহি গো স্বতন্ত্র"।

ইতুপূজা।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

ইতুপূজা প্রতিবর্ষে বঙ্গদেশে অনেক স্থানে অগ্র-হায়ণের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। ইতুপূজার প্রকৃত নাম মিত্রপূজা। চলিত ভাষায় মিত্র শব্দ হইতে ইতু নামের উৎপত্তি। মিত্র হইতে মিতে—মিতুয়া (বন্ধু), পরিশেষে ইতুতে উহার পরিণতি। মিত্র শব্দের অর্থ সূর্য্য। মিত্রপূজা বা ইতুপূজা সূর্য্যপূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সূর্য্যের নাম মিত্র হইল কেন বলা বড় সুকঠিন। তবে শীতের সময় সূর্য্যই যে সকলের বিশেষতঃ দরিদ্রের পরম বন্ধু তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অন্য দিকে "মী" ধাতু হইতে মিত্র শব্দের উৎপত্তি। "মায়য়তি জানাতি সর্ব্বং মিত্রং" (শব্দকল্পদ্রুম) যিনি আমাদের সমস্তই জানেন তিনিই আমাদের মিত্র। ব্রহ্ম পক্ষে অর্থ ধরিলে ঈশ্বর আমাদের সমস্তই জানেন বলিয়া তিনিই আমাদের প্রকৃত মিত্র। বৈদিক সময়ে ঋষিরা সূর্য্য অগ্নি বিদ্যুতে ভগবানের প্রকাশ সন্দর্শন করিতেন। এ কারণে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে সূর্য্যের উপাসনা দেখিতে পাই। বর্ত্তমানে প্রচলিত মিত্রপূজা বা ইতু-পূজা-পদ্ধতি পুরাণের ভিতর দিয়া রূপান্তরিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গের কোন কোন স্থানে অগ্রহায়ণের প্রথম হইতে ইতুপূজার সূচনা হইয়া প্রতি রবিবার উহার বিশেষ অনুষ্ঠান হয় এবং অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তিতে পূজার পরিসমাপ্তি হয়। সূর্য্যের একটি নাম রবি। সম্ভবতঃ এই কারণে অগ্রহায়ণের প্রতি রবিবারে ইতু বা সূর্য্য পূজার প্রচলন আছে। কলিকাতার সান্নিধ্যে কোন স্থানে ছোট ঘট বা ভাঁড়ের পরিবর্ত্তে তিনটি বড় জালায় জল পুরিয়া উহাতে ইতুপূজা ও সঙ্গে সঙ্গে জাঁক-জমকের সহিত বারোয়ারি হয়।

এই মিত্রপূজা শুদ্ধ এ দেশে নহে, প্রাচীনতমকালে সকল সুসভ্য দেশে ইহার প্রচলন ছিল। পারসিক দিগের মধ্যে এই মিত্রের নাম মিথ্র। পহ্লবী শাস্ত্রে মিত্রের নাম মিহির। মিসর ও গ্রীকদেশে মিত্রপূজার প্রচলন ছিল। রোমের সম্রাটগণের আগ্রহে মিত্রপূজা সমস্ত রোমসাম্রাজ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। 'বিশ্বকোষ' বলেন, গ্রীক ও রোমানগণ এই মিত্রের উদ্দেশে নরবলি দিতেন। পারসিকগণ যেখানে মিত্রের পূজা করিতেন তাহার নাম মিথ্রিওন বা মিত্রমন্দির; মিথ্রিওন সম্ভবতঃ মিত্রভবন এই বাক্যের রূপান্তর।

প্রাচীন আর্য্যগণ হিমপ্রধান দেশে অবস্থান করি-তেন। অগ্নি ও সূর্য্যের উত্তাপ ভিন্ন তাঁহাদের দৈনিক জীবন চলিত না। সে কারণে মনে হয় অগ্নি ও সূর্য্য

বিশেষভাবে তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সূর্য্যপূজা ও অগ্নি সহকারে যজ্ঞ ভিন্ন তাঁহাদের একটি দিনও চলিত না। সূর্য্যের বা মিত্রের ধ্যান হইতেছে—"রক্তাম্বুজাসনং অশেষ-গুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্তজগতাম্ অধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরং দধতং করাব্জৈর্মাণিক্য-মৌলিম্ অরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রং"। ছোট ছোট ঘট জলে পূর্ণ করিয়া বসাইতে হয়। পৌরাণিক সর্ব্ববিধপূজাতে প্রথমে ধ্যানান্তে পুষ্পাদি নিজ মস্তকে দিয়া আরাধ্য দেবতা ও নিজ আত্মাকে অভেদজ্ঞান করিতে হয় এবং হৃদয় মধ্যে তেজোময় ঐ দেবতার স্বরূপ চিন্তা করিয়া মানস অর্চ্চনা করিতে হয়; এবং বাম নাসিকারন্ধ্র হইতে নির্গত প্রশ্বাস বায়ু সহ হস্ততলস্থ পুষ্পে সেই তেজ আরোপ করিয়া পূজাধারে সংস্থাপন পূর্ব্বক বাহ্যপূজার জন্য দেবতার নাম অনুসারে "ইহ আগচ্ছ ইহ আগচ্ছ" এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া পুনশ্চ ধ্যান সহ তাঁহার পূজা করিতে হয়। পূজা সাধারণত পঞ্চ উপচারে ও দশ উপচারে সম্পন্ন হয়। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য ইহাই পঞ্চোপচার। দশোপচার হইতেছে পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয় (মুখ-প্রক্ষালনার্থ জল), পানীয় (সুবাসিত কর্পূর মিশ্রিত জল), গন্ধ (চন্দন), পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য (উপকরণাদি সহ), ও পুনরাচমনীয় জল। পরে "জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং, ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া এই পূজার পরিসমাপ্তি হয়।* নারায়ণ (শিলাবিগ্রহ) বা প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির বিসর্জ্জন নাই। যাঁহারা মৃত্তিকায় শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পূজান্তে তাহার বিসর্জ্জন করেন, তাহাদের বিসর্জ্জনের মন্ত্র এই—"আবাহনং ন জানামি, নৈব জানামি পূজনং, বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর" ইহা পাঠ করিয়া শিবলিঙ্গ কাত করিয়া দেন। অন্যান্য দেবদেবীর সম্বন্ধে বিসর্জ্জনের মন্ত্র স্বতন্ত্র। প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন নামে সূর্য্যপূজার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে; যথা—"আদিত্যহৃদয়ে"—"অরুণো মাঘমাসেষু, সূর্য্যো বৈ ফাল্গুনে তথা; চৈত্রে মাসি চ বেদাঙ্গো, বৈশাখে তপনঃ স্মৃতঃ। জ্যৈষ্ঠে মাসি তপেদিন্দ্র আষাঢ়ে তপনে রবিঃ। গভস্তিঃ শ্রাবণে মাসি যমো ভাদ্রপদে তথা; ঈষে হিরণ্যরেতাশ্চ, কার্ত্তিকে চ দিবাকরঃ। মার্গশীর্ষে তপেন্মিত্রঃ, পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ"। পূজা সমাপ্ত হইয়া গেলে এই পূজার ব্রতকথা আছে, তাহা বর্ণিত হইল। গৃহিণীগণের মধ্যে যাঁহার বয়স অধিক তিনি মুখে মুখে নিম্নলিখিত উপাখ্যান বলেন। বাটীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সকলেই ঔৎসুক্যের সহিত কথা শ্রবণ করে। উপাখ্যানটি এই—

"একটি দরিদ্র ঔদরিক ব্রাহ্মণ ছিল। অগ্রহায়ন মাসের শুক্লপক্ষে প্রতি গৃহস্থের গৃহে পিষ্টকাদি প্রস্তুত হইতেছে; তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের বিশেষ লোভ হইল। সে বাড়ীতে আসিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল, ঘরে ঘরে পিষ্টকের আয়োজন দেখিলাম, তুমিও আজ কর না? ব্রাহ্মণী বলিল, গৃহে কিছুরই ত সংস্থান নাই, কোথা হইতে হইবে? তুমি চাউল, নারিকেলাদি ভিক্ষা করিয়া আন, আমি করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ পরদিন সমস্তই আনিয়া দিল। ব্রাহ্মণের সংসারে দুই কন্যা, একটি পুত্র, নিজে ও ব্রাহ্মণী। পেটুক ব্রাহ্মণ বলিল, পিষ্টক যাহা প্রস্তুত হইবে তাহা আমিই সব খাইব, পুত্র-কন্যাকে একখানিও দিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ একে নিরক্ষর, তাহার উপর উদরসর্ব্বস্ব। পুত্র-কন্যা কাহারও প্রতি ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র মমতা ছিল না। ব্রাহ্মণী কন্যা-দুইটিকে ও পুত্রকে অগত্যা সন্ধ্যার পরে ঘুম পাড়াইয়া পিটে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ নিজে গণনা করিতে জানিত না। সে রান্নাঘরের পশ্চাতে থাকিয়া ছ্যাঁক করিয়া গরম খোলার উপর যেমন এক-একখানি পিষ্টকের গোলা ফেলা হইতে লাগিল সে অমনি একটা সরু দড়িতে এক-একটি গেরো বাঁধিতে লাগিল। যে কয়েকখানি পিটে হইল, দড়ীতে ততগুলি এক-এক করিয়া গেরো পড়িল।

"ব্রাহ্মণ পরদিন প্রাতে উঠিয়া খিড়কির পচা পুকুরে স্নান করিয়া কাঁকড়ার মাটীর তিলকসেবা করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল, পিটে যাহা করিয়াছ সমস্তই আমাকে দাও। কন্যা-দুইটার নাম উম্‌না ও ঝুম্‌না। তাহাদের কাতর ক্রন্দনে ব্রাহ্মণী দুই কন্যাকে দুইখানি পিটে ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারে ইতিপূর্ব্বে দিয়াছিল। ব্রাহ্মণ খাইতে বসিল, এক-একখানি পিটে খায় আর এক-একটি করিয়া দড়ীর গেরো খোলে। সমস্ত পিটে নিঃশেষ করিবার পর দেখিল, দুইটি গেরো অবশিষ্ট রহিয়াছে। দুইখানি পিটে কোথায় গেল, ব্রাহ্মণ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণী বলিল, কন্যা-দুইটি বড় কাঁদিতেছিল, তাই উহাদিগকে এক-একখানি দিয়াছি। ব্রাহ্মণ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, আজই উহাদিগকে বনবাস দিব। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ উম্‌না ও ঝুম্‌নাকে বলিল, "তোরা মামার বাড়ী যাবি?" বড়টি সম্মত হইল, ছোটটি চালাক ছিল, সে দিদিকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল, পিটে খাইয়াছিলাম

* শাস্ত্র অনুসারে মানস-উপচার হইতেছে—"আত্মা গন্ধং, মনঃ পুষ্পং ধী-র্ধূপং, জ্ঞানদীপকম্ চক্ষুর্নৈবেদ্যকঞ্চৈব মানসোপচারাঃ স্মৃতাঃ। আত্মা—গন্ধ, মন পুষ্প, ধী ধূপ, জ্ঞান দীপ ও চক্ষু নৈবেদ্য মানসপূজায়, এই সকল উপচার চিন্তা করিতে হয়।

তন্ত্রোক্ত শ্লোক।

বলা বাহুল্য যে, স্থূল পূজার পরিবর্ত্তে আমরা ঈদৃশ মানসপূজার পক্ষপাতী।

বলিয়া বাবা আজ আমাদিগকে বনবাস দিবেন। তাই মামার বাড়ীর নাম করিয়া আমাদিগকে অরণ্যে লইয়া যাইতে চান। পিতার আদেশে পিতার সঙ্গে তাহারা বাটীর বাহির হইল। ক্রমে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ সঙ্গে ছেঁড়া চুল লইয়াছিল। রাত্রি সমাগত হইতে না হইতে পথশ্রমে কন্যা-দুইটি অরণ্যের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ দুইখানি ইষ্টকের উপর তাহাদের মাথা রাখিয়া সেই অরণ্য হইতে নিজে বাহির হইয়া পড়িল এবং ছেঁড়া চুল চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে কন্যাদুইটি জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, পিতা নাই। বড়টি ছেঁড়া চুল দেখিয়া বলিল, বাবাকে বাঘে লইয়া গিয়াছে! ছোট মেয়েটি বলিল, বাবা পলাইয়াছে; এ সমস্তই তাহার কৌশল। বাবা মরে নাই। তাহারা নিরাশ্রয় ও ভীত হইয়া অরণ্যের বৃক্ষের নিকট আশ্রয় চাহিল। সে সময়কার জাগ্রত বৃক্ষেরা তাহাদিগকে নিজ কোটরে নিরাপদ আশ্রয় দিল। অগ্রহায়ণ মাস, শুক্লপক্ষ রবিবার।

"স্বর্গের বিদ্যাধরীগণ এই শুভতিথিতে সূর্য্য উপাসনার জন্য মর্ত্ত্যে এক সরোবরের নিকট নামিয়াছিলেন। তাঁহারা নিরাশ্রয় বালিকা-দুইটিকে দেখিয়া বলিলেন, তোমরা স্নান করিয়া আইস। ঐ দুরদৃষ্ট কন্যাদ্বয়ের সংস্পর্শে সরোবর শুষ্ক হইয়া গেল। তাহারা স্বর্গের বিদ্যাধরীদিগের নিকট আসিয়া অবস্থা নিবেদন করিল। তাঁহারা একটি অঙ্গুরী উহাদের হস্তে দিলেন, অঙ্গুরী স্পর্শে সরোবর জলে পূর্ণ হইয়া গেল। তাহারা স্নান করিয়া আসিয়া ঐ সূর্য্যপূজায় যোগ দিল। বিদ্যাধরীগণ যাইবার সময় তাহাদিগকে পূজার ঘট ও সামান্য আহার্য্য বস্তু দিয়া গেলেন। তাহারা অরণ্যে শাকসব্জি সংগ্রহ করিতে গেল। যাইতে যাইতে ছোট কন্যাটির পায়ে কি একটা ঠেকিল। তুলিয়া দেখে, উহা একটা সোণার বাট। সুবর্ণ পাইয়া তাহারা ক্রমাগত বলিতে লাগিল, হে সূর্য্য! দয়া কর। ইহার ফলে তাহাদের পিতামাতার অবস্থা ফিরিয়া গেল। কন্যা-দুইটি বলিল, চল বাটী ফিরিবার চেষ্টা করি। ঝুম্‌না বলিল, আসিবার সময়ে আমি পথে এক-একটি তেঁতুলের বীচি ছড়াইয়া আসিয়াছি, উহাই আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবে। এইরূপে তাহারা পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, পিতার সৌভাগ্য ফিরিয়াছে। পিতা তাহাদিগকে দেখিয়া একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। বলিতে লাগিল, এই দুই অপয়া মেয়েকে বিদায় দিয়া আমি ভাগ্যমন্ত হইতে পারিয়াছি। আবার কোথা হইতে ইহারা আসিয়া জুটিল। কন্যাদ্বয় পিতাকে বুঝাইয়া বলিল যে, তোমার এই ভাগ্যপরিবর্ত্তন আমাদের সূর্য্যদেবতার পূজার ফলে। তুমি রাজার বাড়ী যাও, আমাদের সূর্য্যপূজার ফলে তুমি রাজার সভাপণ্ডিত হইবে। ব্রাহ্মণ বলিল, আমি নিরক্ষর ও মূর্খ। কন্যাদ্বয় বলিল, তুমি যাও, আবশ্যকীয় পাণ্ডিত্য তোমাতে আবির্ভূত হইবে। ব্রাহ্মণ তাহাই করিল। রাজসভায় তাহার যথেষ্ট আধিপত্য। ক্রমে রাজপুত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠা কন্যার ও পাত্রপুত্রের সঙ্গে কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। ছোট কন্যা মাতাকে বলিল, ঘট আনিয়া ইতুপূজা করিতে আরম্ভ কর, তোমার ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকিবে। উম্‌না রাজার গৃহলক্ষ্মী হইয়া ইতুপূজা হইতে বিরত হওয়ায় রাজ্যের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। হাতীশালে হাতী মরিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরিতে আরম্ভ করিল, চারিদিকে মারীভয়, রাজ্যময় অশান্তি। লোকে তাহাকে সুবর্ণের পাত্রে বরণ করিতে যায়, তাহার স্পর্শে সোণা পিতল হইয়া গেল। ইতুপূজা করিত বলিয়া ঝুম্‌নার ঐশ্বর্য্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাহাকে পিত্তলের পাত্রে বরণ করিবার সময় পিত্তল সুবর্ণে পরিণত হইল। রাজার ছেলে বিরক্ত হইয়া নিজ পত্নীকে নিরাভরণা করিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল।

"এদিকে ব্রাহ্মণের পুত্রের বিবাহ উপস্থিত। ব্রাহ্মণ পুত্রকে লইয়া কিছুদুর যাইতে না যাইতে দেখিলেন যে তিনি গামছাখানি বাটীতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। তিনি বাটীতে ফিরিয়া গিয়া দেখেন যে, ব্রাহ্মণী সমস্ত আয়োজন করিয়া ঘট লইয়া ইতুপূজা করিতেছেন। তিনি গামছা খুঁজিয়া না পাইয়া ব্রাহ্মণীকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী পূজায় ব্যস্ত, তাঁহার নিকট সদুত্তর না পাইয়া ইতু-ঘট পা দিয়া ফেলিয়া দিলেন, এবং গামছা লইয়া চলিয়া গেলেন। ইহার ফলে ব্রাহ্মণের বাটীতে দুর্গতি আরম্ভ হইল।

"উম্‌না নিরাশ্রয়া হইয়া ভগিনীর বাটীর সন্ধানে বাহির হইল; এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ঝুম্‌নার খিড়কীর পুকুরের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। ঝি জল তুলিতে আসিয়াছিল, তাহাকে দিয়া ভগিনীকে সংবাদ দিল। কিন্তু উম্‌নার দুর্ভাগ্য এতই অধিক হইয়াছিল যে পরিচারিকা সংবাদ দিতে বিস্মৃত হইল। পরে আবার পরিচারিকা জল লইতে উপস্থিত। এবার উম্‌না স্মরণ থাকিবে বলিয়া একটী কুশের অঙ্গুরী কলসীর ভিতর ফেলিয়া দিল। এবারেও পরিচারিকা বিস্মৃতা। ঐ কলসীর জল অঙ্গে ঢালিবার সময় ঝুম্‌না দেখিল, উহাতে একটা কি রহিয়াছে। ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল—এটা কি? আমাকে কি তুক করেছ? ঝি বলিল, তোমার ভগিনী ঘাটে বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে তোমাকে সংবাদ দিবার জন্য কয়েকবার বলিয়াছিলেন, আমি প্রতিবারই ভুলিয়া গিয়াছি, তাই তিনি চিহ্ন-

স্বরূপ ঐ অঙ্গুরী জলের ভিতর ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ঝুম্‌না তাই শুনিয়া ভগিনীকে বাটীতে ডাকিয়া আনিল, এবং অলঙ্কারাদি ও বস্ত্র দিয়া তাহাকে বিভূষিত করিল।

"এদিকে ইতুপূজা করিতে না পাইয়া ব্রাহ্মণীর দুর্গতির সীমা নাই। তিনি শুনিয়াছিলেন যে ঝুম্‌নার অবস্থা অনুকূল। তাই ব্রাহ্মণের পরামর্শে ব্রাহ্মণী কন্যাকে দেখিতে এবং কন্যার নিকট সাহায্যপ্রার্থিনী হইয়া একদিন আসিলেন। কন্যা, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মাতাকেও সাদরে গৃহে রাখিলেন। ক্রমে অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষ উপস্থিত হইল। ঝুম্‌না নিষ্ঠাবতী হইয়া ইতুপূজার সমস্ত আয়োজন করিলেন। মাতা ও ভগিনীকে বলিলেন, তোমরা নিরাহারা হইয়া পূজা কর। কিন্তু উহারা সেদিন পূজার পূর্ব্বেই সামান্য কিছু খাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর দিন ঝুম্‌না তাহাদিগকে স্নান করাইয়া চুলে চুলে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া খাটের পায়াতে বাঁধিয়া রাখিয়া পূজার আয়োজন করিল এবং সকলে মিলিয়া ইতুপূজা করিল। ইহার ফলে ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি ফিরিয়া আসিল। উম্‌নাকে তাঁহার স্বামী একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইতুপূজার ফলে সেই অস্মরণ-রাজার (অর্থাৎ যিনি সবই ভুলিয়াছিলেন) পত্নীকে স্মরণ হইল এবং তাহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তাঁহারও সর্ব্ববিধ অশান্তি ঘুচিয়া গেল। রাজসংসারে ও প্রজাগণের মধ্যে সুখ-সৌভাগ্য ফিরিয়া আসিল। মারীভয় অকালমৃত্যু বিদূরিত হইল। প্রজাগণ প্রতিবর্ষে ইতুপূজা করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণী প্রতিবর্ষে অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষ রবিবারে ইতুপূজা করায় ধনধান্যে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল; তাঁহাদের সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য বিনষ্ট হইল।"

উপরে ইতুপূজার মেয়েলি কথা সমাপ্ত হইল। ফলকামনার ভিতর দিয়া বঙ্গে নানা ব্রত ও পূজা যে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অন্য অন্য ব্রত সম্বন্ধে যে সমস্ত ব্রতকথা আছে তাহা সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। উহা পাঠ করিবার জন্য আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বাগ্রে মানসপূজার বিশেষ সার্থকতা স্বীকার করেন। এই মানসপূজার সহিত বাহিরের মূর্ত্তির কোন সম্বন্ধ নাই। ভগবানের সহিত আপনার অভেদত্ব সম্যক প্রতীতি করিয়া নিজ মস্তকের উপরে পুষ্প স্থাপন করিলেই তাহাতে ভগবানের পূজা হয়। তান্ত্রিক পূজা মাত্রেই এই অভেদ বা অদ্বৈততত্ত্ব নিহিত। এই অভেদত্ব বা অদ্বৈতবাদের ভাব এই যে, ভগবান যখন প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যে বিরাজমান, তখন সেই ভাবটি গাঢ়রূপে অনুভব করিতে গেলে আমাদের পৃথক সত্তা তাঁহারই সত্তাতে যেন ক্ষণেকের জন্য বিলীন হইয়া যায়। একভাবে বলিতে গেলে এই অদ্বৈততত্ত্ব তন্ত্রোচিত পূজার প্রাণস্বরূপ।

মানসপূজা করিয়া পরে বাহ্যপূজায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। ধ্যানের মন্ত্রে সমধিক পরিমাণে কবিত্ব নিহিত করিতে গিয়া উহার ফলে পুরাণ-তন্ত্র কথিত দেবদেবী মূর্ত্তিমান বা মূর্ত্তিমতী হইয়া পড়িয়াছেন, এবং বাহ্য পূজায় ধ্যানের অনুরূপ দেবদেবী গঠিত হইয়া নিতান্ত স্থূলভাবে এদেশে পূজিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সমস্ত ধ্যানের মন্ত্রের ভিতর হইতে রূপক ও ভাষাগত অলঙ্কারের অংশ বাদ দিলে অথবা উহার গূঢ়ার্থ নিরূপণ করিবার চেষ্টা পাইলে ফলিতার্থ নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরে সহজে প্রযোজ্য হয়। কালভেদে অবস্থাভেদে ও জ্ঞানভেদে অর্থাৎ দুর্ব্বল সাধকের জন্য বাহ্যপূজায় মূর্ত্তির কল্পনা আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঐ সমস্ত পূজাপদ্ধতি ও ধ্যানের মন্ত্রের ভিতরে নিরাকার ঈশ্বরের সাধনা যে প্রশস্ততর, তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্ব দেবদেবীর সম্বন্ধে মূর্ত্তিনিরপেক্ষ মানসপূজার বিধান উহার অন্যতম সাক্ষী।

আমাদের আর একটি কথা এই যে জনসাধারণকে ধর্ম্মানুগত করিবার জন্য, ঐশ্বর্য্যলাভের প্ররোচনা এদেশে প্রচলিত ব্রত ও পূজার অন্তর্ভূত। উহা না থাকিলে সহজে জনসাধারণকে ধর্ম্মের দিকে ও পুণ্য অনুষ্ঠানের দিকে আকৃষ্ট করিতে পারা যাইবে না, ইহা শাস্ত্রকারগণ সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন।

ব্রাহ্ম ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের প্রতি সবিনয় নিবেদন।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

আমি অনেক দিন পরে সুদূর গোরক্ষপুর হইতে তোমাদের সঙ্গে মাঘোৎসবে যোগ দিতে এসেছি; আর দেখতে এসেছি তোমরা ধর্ম্মের পথে, সাধনার পথে, ভগবানের পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছ। তোমরা মৃতপ্রায় ব্রাহ্মসমাজকে জাগাইবার জন্য কত দূর প্রস্তুত হয়েছ। তোমরা ক্ষুদ্রের গণ্ডি, সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি ছেড়ে অনন্ত অসীমের দিকে কতদূর ছুটেছ। তোমরা ভগবানের কাছে কতদূর ছোট হতে পেরেছ। তোমরা মৃত্যুকে কত দূর অতিক্রম করতে পেরেছ। তোমরা স্বার্থকে ছেড়ে ত্যাগের পথে কতদূর এগিয়েছ। তোমাদের অকৃত্রিম প্রেমে ও ভালবাসায় জগতের কতখানিকে আবরণ করেছ। তোমরা ভগবৎপ্রেমানন্দের কতটুকু আস্বাদ পেয়েছ। তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান কতদূর জাগ্রত হয়েছে।

তোমরা কি সত্য-সত্যই ভগবানকে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ? তোমাদের প্রাণ কি সত্য-সত্যই তাঁহার জন্য ব্যাকুল হয়েছে? মনে কর, তোমাদের ঘরে একটি ছোট খোকা আছে, যাহাকে একদণ্ডও না দেখলে তোমরা অস্থির হয়ে পড়। মনে কর, কোন বিশেষ কারণবশতঃ সেই খোকাকে ছেড়ে দূরদেশে গিয়ে কিছুকাল থাকতে হল। অনেক দিন পরে তোমরা বাড়ী আসছ। পথে নানা বিপদের মধ্য দিয়ে আসতে হল। তোমাদের সমস্ত জিনিস-পত্র চুরি হয়ে গেছে, কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে গেছে, হাতে একটিও পয়সা নাই, অনাহারে অনিদ্রায় অতিশয় কাতর হয়েছ। এইরূপ অবস্থায় তোমরা তোমাদের ষ্টেসনে এসে পৌঁছুলে। তখন তোমাদের মনে এই ইচ্ছা উৎপন্ন হ'ল যে, বাড়ী গিয়ে ময়লা কাপড় ছেড়ে, স্নান-আহার করে, একটু বিশ্রাম করে ক্লান্তি দূর করবে। কিন্তু তাহা হল না। তোমরা বাড়ীর সম্মুখে আসিবা মাত্রই তোমাদের চাকর-চাকরাণী বা বাড়ীর কেহ এসে বললে যে, যে খোকাকে তোমরা এত ভালবাস, সে একটু আগে খেলতে খেলতে কোথায় চলে গেছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না। তখন তোমাদের কি অবস্থা হ'ল? তোমরা ক্লান্তির কথা ভুলে, আরামের কথা ভুলে, নিজেকে ভুলে, সংসারকে ভুলে, জগতকে ভুলে, এমন কি ভগবানকেও ভুলে খোকার জন্য পাগলের মত চারিদিকে ছুটতে লাগলে, খোকাই তখন তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য। তোমাদের হৃদয়ে এক মহা উদ্বেগ উপস্থিত হল, অশান্তি এসে তোমাদের হৃদয়কে অধিকার করে বসল। পরে সমস্ত দিনের শেষে খোকাকে পেয়ে সকল কষ্ট দূর হয়ে গেল, আনন্দে ভেসে গেলে, হাতে যেন স্বর্গ পেলে। কিন্তু এত উদ্বিগ্নতা, এত ব্যস্ততা, এত ব্যাকুলতা কার জন্য? একটি ক্ষুদ্র জীবের জন্য—যার মূল্য এক সেকেণ্ড মাত্র। কিন্তু এই খোকার তুলনায় সেই অনন্ত অসীম ভগবান—কত বড়, কত সুন্দর, কত প্রিয়! ওগো তোমরা আমাকে বল, তাঁর জন্য তোমরা কত উদ্বিগ্ন, কত ব্যাকুল হয়েছ? তোমরা তাঁর জন্য কত ছুটোছুটি করেছ? তোমরা তেমনি করে নিজেকে ভুলে, সংসারকে ভুলে, জগতকে ভুলে কি তাঁকে পেতে চেষ্টা করেছ? ভগবানকে পাওয়া কি সহজ কথা! ব্রাহ্ম হওয়া কি সহজ কথা! পূজ্যপাদ মুনি-ঋষিগণ কত কঠোর সাধনা করে 'ব্রাহ্ম' নাম পেয়েছিলেন। তোমরা কি বিনা সাধনায় ব্রাহ্ম হতে চাও?

তোমরা কি ভগবানকে সত্য-সত্যই ভালবাসতে পেরেছ? যদি পেরে থাক ত কতটুকু পেরেছ? ভগবান বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁকে ভালবাসতে হলে বিশ্বসংসারের প্রতি অণুপরমাণুকে ভালবাসতে শিখতে হয়। এই বিশ্বসংসারের যেটুকু তোমাদের ভালবাসার বাইরে থাকবে, তোমাদের ভগবানের প্রতি ভালবাসা ততটুকু কম হয়ে যাবে। তোমরা যখন কাহাকেও ভালবাস তখন তাহার কেবল হাতটি, পাটি, মুখটি, কি অপর কোন অংশটিকে বা কয়েকটি অংশকে কি ভালবাস?—না তাহার সমস্ত শরীর, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সমস্ত সৌন্দর্য্যকে ভালবাস? তবে ভগবানের প্রতি ভালবাসায় কৃপণতা করবে কেন?

তোমরা কি সত্য-সত্যই প্রকৃত আনন্দ লাভ করতে যত্নশীল হয়েছ? আনন্দময়ের আনন্দময় বিশ্বের আনন্দ-সাগরে ভেসে তোমাদের পিপাসা কি কিঞ্চিৎ মিটাতে পেরেছ? না চাতক পক্ষীর মত জলাশয়ে বাস করেও একবিন্দু জলের জন্য আকাশের পানে চেয়ে ছটফট্ করছ? যারা আনন্দ পেয়েছে তারা ভগবানের সৃষ্ট সকল বস্তুতেই—সকল কার্য্যেই তাঁহার মঙ্গলহস্ত দেখে আনন্দ উপভোগ করে। তোমরা কি সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, শান্তি-অশান্তির মধ্যে সমভাবে অবস্থিত ভগবানের মঙ্গল-হস্ত দেখে আনন্দে ভাসতে পেরেছ?

তোমরা কি অমৃতময়ের পুত্র হয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পেরেছ? তোমরা কি "মৃত্যু হতে আমাদিগকে অমৃতে লইয়া যাও" এই প্রার্থনার সার্থকতা করতে পেরেছ? মৃত্যুতে কাতর হওয়া যে ঘোর স্বার্থপরতা এটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছ? মৃত্যুতে লোকে কাঁদে কেন? মৃত ব্যক্তির দ্বারা আমাদের যত স্বার্থ সিদ্ধ হয়েছে অথবা হবার সম্ভাবনা ছিল তাহারই জন্য নয় কি? যাদের দ্বারা আমাদের কোন স্বার্থ সিদ্ধ হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনাও নাই, তাদের মৃত্যুর জন্য আমরা কাঁদি কি? স্বার্থই কি আমাদের যত শোক, যত কান্নার মূল নহে? এই স্বার্থটিকে কি তোমরা অতিক্রম করতে পেরেছ? যদি না পেরে থাক, তবে মৃত্যুতেও আনন্দ কেমন করে দেখতে পাবে?

তোমাদের যত কৃপণতা দেখছি ভগবানের প্রতি! তোমরা কার জন্য এত কৃপণতা কর? স্ত্রী-পুত্রের জন্য? সংসারের জন্য? এই স্ত্রীপুত্র, এই সংসার—কার? তোমাদের না ভগবানের? যদি তোমাদের হ'ত তোমরা এ সকলকে ধ্বংসের হস্ত হতে রক্ষা করতে পারতে। আসলে তোমরা ভগবানের 'মালগুদামের' মালবাবু মাত্র। মাল সংসার—প্রেরকও ভগবান, গ্রাহকও ভগবান। তোমাদের জিম্মায় মাল থাকে এই মাত্র। রেলের মালবাবু যেমন তাহার গুদামের, তাহার জিম্মার মালকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করে, তোমরাও সেইরূপ সংসাররূপ মালকে রক্ষা করতে স্বতঃপরত বাধ্য। রেলের

মালবাবু মালগুলি যত্ন করে রাখে সত্য, কিন্তু তাহার মনে কখন এরূপ ধারণা হয় না যে, সেগুলি তাহার নিজের। পরের মাল তাহার হৃদয়ে দাগ দিতে পারে না। তবে ভগবানের যে মাল তোমার গুদামে আছে, তাহা তোমার হৃদয়ে কেন দাগ দিবে? রেলের মালবাবুর গুদাম হতে মাল চালান হয়ে গেলে সে যেমন আরাম বোধ করে, শান্তিলাভ করে—তোমাদের গুদামের মাল চলে গেলে তোমরা কেন সেইরূপ আরাম ও শান্তি পাও না? অসাধু মালবাবু যেমন পরের মাল চুরি করে জেলখাটে, তেমনি তোমরা ভগবানের মাল চুরি করে আপনার করে নিয়ে কেন শান্তি ভোগ করবে না? তাই তোমরা মায়ার জেলখানায় আবদ্ধ হয়ে দিবারাত্রি জাঁতা পিষতে থাক আর যন্ত্রণায় ছটফট্ কর! এই সংসার ভগবানের—এই বিশ্বাস দাঁড়ালে তোমরা এই অশান্তি হতে নিষ্কৃতি পেতে পার। তোমরা এই বিশ্বাসের পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছ? তোমরা ভগবানের ঘরে চুরি করা বন্ধ না করলে কেমন করে প্রকৃত শান্তি পেতে পার?

তোমরা কি ভগবানের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, তোমাদের আদরের ব্রাহ্মসমাজের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়েছ? অন্ধবিশ্বাসী পৌত্তলিকগণ দরিদ্র হলেও, বিধবা অনাথা হলেও ধর্ম্মের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করে—তোমরা ব্রহ্মবিশ্বাসী হয়ে, প্রকৃত ধর্ম্মের আশ্রয় নিয়ে সেই ত্যাগের পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছ?

তোমাদের প্রাণ ভগবানের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ব্রাহ্মসমাজের জন্য কতদূর জেগেছে? নিজের প্রাণ জাগাতে না পারলে পরের প্রাণ জাগাতে পারা যায় না। যাঁদের প্রাণ জেগেছিল তাঁরা অপরকেও জাগিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা একে একে সকলে চলে গেছেন। আজ রাজা রামমোহন নাই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নাই, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নাই, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ নাই, সাধু শিবনাথ নাই—কে তবে ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ জাগাবে? তোমাদের মধ্যে কয়জন তাঁদের মত প্রাণ জাগাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছ? তোমাদের মধ্যে কয়জনের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সেইরূপ বিশ্বাস ও প্রেম জন্মেছে? তোমাদের মধ্যে কয়জন ব্রাহ্মসমাজকে তাঁদের মত আপনার করতে পেরেছ? তোমরা যে অসীমকে ধরতে গিয়ে ক্ষুদ্রের গণ্ডির মধ্যে, সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডির মধ্যে ক্রমশই আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছ। তোমাদের ঔদাস্যে, তোমাদের কৃপণতায়, তোমাদের স্বার্থের নিষ্পীড়নে আজ ব্রাহ্মসমাজ যে মৃতপ্রায়। তোমরা ত দেখেও দেখছ না, শুনেও শুনছ না; আর কত দিন এমন ভাবে চলবে? কবে তোমাদের চক্ষু ফুটবে? তোমাদের দোষে, তোমাদের কৃপণতায়, তোমাদের আলস্যের জন্য যদি ব্রাহ্মসমাজ নষ্ট হ'য়ে যায়—তাহলে যে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভবসাগর-পারের তরণীটিও অতল জলে ডুবে যাবে। ডুববে সত্য, কিন্তু মনে রেখো, তোমাদের সকলকে নিয়ে ডুববে!

তাই আজ আমি তোমাদের কাছে এসেছি। তোমাদের পায়ে ধরে অনুরোধ করতে এসেছি। ওগো, তোমরা একবার চোখ খুলে দেখ, ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় একবার ভাব আর যাহা তোমাদের কর্ত্তব্য হয় কর। এই মাঘোৎসবের শুভ মুহূর্ত্তেই তোমরা ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও বদ্ধপরিকর হও। ঐ শুন ভগবানের বাণী! ঐ শুন ভগবানের মধুর আবাহন! ঐ দেখ তাঁহার ইঙ্গিত! ব্রাহ্মগণ, একবার জাগ—জাগাও, একবার ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমাদের প্রিয়তম, প্রাণতম, অর্দ্ধমগ্ন ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা কর। একবার ডুবলে আর তুলতে পারবে না—সে ক্ষমতা তোমাদের নেই।

মহাত্মা ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বঙ্গীয় আকাশ হইতে একটি অনুপম অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর নাই। বিগত ৪ঠা মাঘ সোমবার রাত্রিশেষে চারিটার সময় তাঁহার অমর আত্মা দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া মহাপ্রয়াণে যাত্রা করিয়াছে। দেহাবসানের সময় তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরলোকগমনের দিন ৬ই মাঘ, আর দ্বিজেন্দ্রনাথের তিরোভাব ৪ঠা মাঘ। দেবেন্দ্রনাথ ৮৯ বৎসর বয়সে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের আয়ুঃ পিতা অপেক্ষা ২ বৎসর অল্প হইয়াছিল। বিগত তিন-চারি বৎসরের মধ্যে স্বনামখ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। রহিলেন অসীম প্রতিভাসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ, আর কন্যাগণের মধ্যে স্বর্ণকুমারী ও বর্ণকুমারী। মহর্ষির পুত্র-কন্যাগণ প্রায় প্রত্যেকেই যে মনীষা লইয়া আসিয়াছিলেন, দেশ-বিদেশস্থ যে কোন পরিবারেই তাহার তুলনা বিরল। দ্বিজেন্দ্রনাথের দেহান্ত বোলপুরে হইয়াছে। তিনি তাঁহার শেষ জীবন বোলপুর-শান্তিনিকেতনেই কাটাইয়া গেলেন। তাঁহার সারল্য, তাঁহার জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য, তাঁহার ওজস্বিনী চিন্তাশীলতা, তাঁহার স্বদেশপ্রেম—সবই অত্যদ্ভুত। ৺দ্বারকানাথ যখন দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা করেন, তখন মহর্ষির তিনটি মাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ আর হেমেন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথ বাল্যে পিতামহের অসীম ঐশ্বর্য্যের লীলা দেখিয়াছিলেন। নিজেও প্রাচুর্য্যের মধ্যে লালিত-পালিত। কিন্তু তাঁহার জীবনের

কোন অংশে বিলাস ও মাৎসর্য্য স্পর্শ করিতে পারে নাই। বাল্যকোচিত সারল্য তাঁহার চিরসঙ্গী ছিল। তাই তিনি ধনী-দরিদ্র সকলের সহিত সমান ভাবে মিশিতে পারিতেন। অধ্যয়নস্পৃহা তাঁহার সমস্ত জীবনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। দার্শনিকতার রাজ্যে তিনি যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন তাহা সত্যই দুর্লভ। সরল ও সহজ ভাষায় দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ করিবার পটুতা তাঁহার অনন্যসাধারণ। কেবল যে পাশ্চাত্য দর্শনে তাহা নহে, দেশীয় দর্শনশাস্ত্রেও তাঁহার তুল্য অধিকার ছিল। কেবল দর্শন বলি কেন, কবিত্বের হিসাবে "স্বপ্নপ্রয়াণে" তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। কল্পনাকে যে কতদূর প্রসারিত করা যাইতে পারে, ভাষাকে যে কতদূর সরল প্রাণস্পর্শী ও মানসিক ভাবের প্রকাশোপযোগী করা যাইতে পারে, স্বপ্নপ্রয়াণের পত্রে পত্রে তাহার বিস্ময়কর নিদর্শন রহিয়াছে। যখনই পাঠ করি, তাঁহার লিপিকুশলতা আমাদিগকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার রচিত স্বপ্নপ্রয়াণ অননুকরণীয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কেবল কাব্যগ্রন্থ বলি কেন, তাঁহার বিরচিত ব্রহ্মসঙ্গীতও মাধুর্য্যে কবিত্বে ও হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে পরিপূরিত। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের সরল পদ্যানুবাদেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সারল্যপূর্ণ অট্টহাস্য গৃহকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিত।

তিনি মহাত্মা গান্ধীর মতের পরিপোষকতা করিতেন এবং পি, সি রায়ের খদ্দরপ্রচারের মতাবলম্বী ছিলেন। নিজেও চরকা কাটিবার প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার হৃদয় স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ ছিল। তিনি দেশের বিশেষ কল্যাণকামী ছিলেন। এই স্বদেশপ্রেম তাঁহার জীবনের একটি দিক। 'হিন্দুমেলার' সময় ঠাকুর-পরিবারের কৃতিত্ব দেখিয়াছি, আর দেখিয়াছি দ্বিজেন্দ্রনাথের জলন্ত উৎসাহ। একভাবে বলিতে গেলে "হিন্দুমেলার" প্রতিষ্ঠা এ দেশের শিক্ষিতমণ্ডলীর ভিতরে স্বদেশপ্রেমের প্রথম জাগরণ আনিয়া দিয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথের রচিত "জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়" রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তমসাগমে প্রাভাতিক সূর্য্যোদয়-সূচনার প্রথম কাকলী। ইহার পূর্ব্বে আর কোন জাতীয় সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল কি না জানি না। ভাবে ও বেশবিন্যাসে যাহাতে স্বদেশীয়তা রক্ষা পায়, তাহার জন্য তাঁহার বিশেষ আকুলতা ছিল। ইহাও তাঁহার চরিত্রের আর একটি দিক। তিনি "সাহেবিআনার" বিশেষ বিরোধী ছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার "আর্য্যামি ও সাহেবিআনা" ও "সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা" প্রমুখ কয়েকটি বক্তৃতা তদীয় সুলভ সুমিষ্ট শ্লেষে পরিপূর্ণ ছিল। উহা হইতে যে কতকটা ফলও ঐ সময়ে ফলিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আজকাল তাঁহারই উক্তির প্রতিধ্বনি চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার যে এত বয়স হইয়াছিল, তথাপি একদিনের জন্যও অধ্যয়ন ও লিখন তাঁহাকে পরিহার করে নাই।

ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যরূপে তিনি যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহার বজ্রঘোষী নিনাদ মহর্ষিদেবের বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গনকে প্রতি বৎসর মাঘোৎসব উপলক্ষে প্রকম্পিত করিয়া তুলিত। এক দিকে ভাষার গাম্ভীর্য্য অন্যদিকে যুক্তির অবতারণা ও প্রেম-ভক্তির বিকাশ তাঁহার বক্তৃতাকে জীবন্ত ও প্রাণস্পর্শী করিয়া তুলিত।

মনে হয় সে দিন, যখন "ভারতী"র সম্পাদকরূপে তিনি আবির্ভূত হইলেন। বঙ্গদর্শনের তিরোধানের পর ভারতীই শিক্ষিতসমাজের মুখপত্র ছিল। উহাতে কত মহামূল্য প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকাও তিনি বহুদিন ধরিয়া সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "গীতা" সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা, যাহা পুস্তক আকারে বাহির হইয়াছে, তাহা অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার প্রকাশিত "তত্ত্ববিদ্যা" বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম দার্শনিক গ্রন্থ। উহা ইংরাজিতে ontology নামে অনূদিত হইয়া এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য-পুস্তক নির্ণীত হইয়াছে। তিনি "বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের" সভাপতি ছিলেন। তাঁহার কেহ শত্রু ছিল না। তিনি অজাতশত্রু ঋষি ছিলেন। তাঁহার এই ঋষিপ্রকৃতির পরিচয় পাইয়া শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালীন বনের চড়াই পাখী নির্ভয়ে তাঁহার হস্ত হইতে তণ্ডুলকণা লইয়া যাইত, কাঠবিড়ালী তাঁহার গাত্রের উপর অবাধে বিচরণ করিত।

জ্যামিতিশাস্ত্রের কয়েকটী প্রতিজ্ঞা তিনি নবভাবে সমাধান করিয়াছিলেন। তাহার পরিচয় 'ভারতীর' পুরাতন সংখ্যায় বিরাজমান। বাঙ্গালা ভাষায় 'রেখাক্ষর' (Short-hand) যাহা তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন, তাহা তাঁহার প্রতিভার আর একটি দিক। তাঁহার মত সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া জন্মাইতে বড় কাহাকেও দেখা যায় না। তাঁহার সমগ্র রচনা একত্রিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ হইতেছিল, দুই-তিন খণ্ড মাত্র বাহির হইয়াছে। তিনি সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ছিলেন; ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আদিব্রাহ্মসমাজে তিনি প্রতি বুধবার হারমোনিয়ম বাজাইতেন আর বিষ্ণু বাবু গান করিত। জ্যোতি বাবুর স্বরলিপি বাহির হইবার বহু পূর্ব্বে তিনি যে স্বরলিপি বাহির করেন, পুরাতন তত্ত্ববোধিনী তাহার সাক্ষ্যস্থল।

যখন কেশব বাবু আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই, দ্বিজেন্দ্রনাথকে সকলে "বড়দা" (বড় দাদা) বলিয়া অভিহিত করিত। দ্বিজেন্দ্রনাথের শেষ বয়সে তাঁহাকে বড় দাদা বলিয়া ডাকিবার তাঁহার নিজ পরিবারের দুই চারি জন ভিন্ন আর বড় কেহ বাহিরের লোক জীবিত ছিলেন না। শুনিয়াছি, মহাপ্রাণ এণ্ড্রুজ সাহেব ও মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে বড়দাদা বলিতেন। পরিণত বয়সে দ্বিজেন্দ্রনাথ বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও কি সাহিত্যিক, কি কবি, কি দার্শনিক, কি স্বদেশপ্রেমী সকলে আজ তাঁহার অভাবে মুহ্যমান। আজ তাঁহাকে হারাইয়া আমরা সত্যসত্যই দুর্ব্বল ও ম্রিয়মাণ; তাই বঙ্গের চারিদিক হইতে ভক্তির অর্ঘ তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে অর্পিত হইতেছে। ঈশ্বর তাঁহার অমর আত্মাকে নিজ ক্রোড়ে স্থান দান এবং স্বজনের অন্তরে শান্তি বিধান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কেশরী-বংশ।

(রায় মহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় বি-এল)

৪৭৪ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় কেশরীবংশের অভ্যুত্থান হয়। কেশরীবংশীয় রাজগণ ১১৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যাদেশে রাজত্ব করেন। প্রথম হইতে এই বংশীয় রাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন। তাঁহাদের অভ্যুত্থানের সহিত উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়; কিন্তু কোনপ্রকার ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত হয় নাই। প্রায় ১৫০ বৎসর যাবৎ বৌদ্ধধর্ম্ম উড়িষ্যার জনসাধারণের নিকট পূর্ব্বের ন্যায় সমাদৃত হইয়াছিল। কেশরীবংশের প্রথম রাজা যযাতি কেশরী ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত শিব-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার পর দুই জন নৃপতি অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থ ব্যয়ে উক্ত নির্ম্মাণকার্য্য চালাইয়াছিলেন। কেশরীবংশীয় চতুর্থ নৃপতি অলাবু কেশরী বা মতান্তরে ললাটেন্দু কেশরীর রাজত্বকালে ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে এই বিরাট মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়। শিল্পকলার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই মন্দির উৎকলীয় স্থাপত্যকলার উচ্চাদর্শ। মন্দির গাত্রে যেরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখা যায়, সেরূপ কারুকার্য্য আজকাল ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সকল চিত্র হইতে সমসাময়িক রাজদরবারের সুখসৌভাগ্যের আভাস পাওয়া যায়। সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহী পুরুষ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেছে; তাহার বর্ম্ম ও অন্যান্য যুদ্ধসজ্জা ইংলণ্ডের নরম্যান যোদ্ধাদিগের মত। সে সময় যোদ্ধৃগণ সকলে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিত। অশ্বারোহী সেনা বল্লম ও তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিত। তাহাদের সাজসজ্জা দেখিয়া তৎকালীন রাজদরবারের আর্থিক অবস্থা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। পদাতিক সেনা তীর, ধনু ও তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিত; সাজসজ্জায় তাহাদের কোন ত্রুটি ছিল না। হস্তীপৃষ্ঠে সুসজ্জিত হাওদায় রাজা বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনার অনুগমন করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। দুই একটী চিত্রে উভয় পক্ষের হস্তীযুদ্ধ অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সকল চিত্র হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, কেশরীবংশীয় নৃপতিগণ বিত্তবৈভব সৈন্য ও সজ্জা প্রভৃতিতে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ নরপতিদিগের সমকক্ষ ছিলেন।

কেশরীবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ভুবনেশ্বর ও যাজপুর ক্ষেত্র। শিবমন্দির নির্ম্মাণে তাঁহারা অজস্র অর্থব্যয় করিতে কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। সর্ব্বসমেত ৭০০০ সাত হাজারটী শিবমন্দির এক সময়ে ভুবনেশ্বর মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বিদ্যমান ছিল। কোন-কোনটী মন্দির এত সংকীর্ণ যে, একটী লোক কায়ক্লেশে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। আবার কোন কোন মন্দির শিল্পকলার চরম আদর্শস্বরূপ; তাহার প্রাঙ্গণে ও অভ্যন্তরে শত শত যাত্রীর সমাগমের স্থান রহিয়াছে। কুণ্ডল কেশরী ৮১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি পুরীর প্রসিদ্ধ মার্কণ্ডেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী 'ব্রহ্মেশ্বর-মন্দির' উদয়োতক কেশরীর মাতা রাণী কলাবতী: কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১১০৪ খৃষ্টাব্দে কেশরীবংশীয় আর একজন রাণী ভুবনেশ্বরের 'নাটমন্দির' নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দির উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যে ও শিল্পকলায় ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। কেশরীবংশীয় রাজগণ যে সকল শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থপতিবিদ্যা ও শিল্পকলা দেখিলে আজিও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। রাজকোষ শূন্য করিয়া তাঁহারা শিবমন্দিরনিচয় নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। অর্থ, সময় ও পরিশ্রমের দিকে তাঁহারা দৃক্‌পাত না করিয়া আদর্শ তক্ষণশিল্পে ঐ সকল শিবমন্দির মণ্ডিত ও সুশোভিত করিয়াছেন। এই সমুদয়ই তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ। সে সময় হিন্দু রাজগণ যে রাজ্যের আয় বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করিয়া অর্থের অপব্যবহার করিতেন না, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভুবনেশ্বরেই দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর-মন্দিরের দুই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে কেশরীবংশীয় রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। এই স্থানেই তাঁহারা অধিকাংশ সময় বসবাস করিতেন এবং ভুবনেশ্বরই কেশরীবংশীয় রাজাদিগের সর্ব্বপ্রথম রাজধানী ছিল। রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ

পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, এক সময়ে তথায় একটী সুদৃঢ় দুর্গ ও সেনানিবাস ছিল। অদ্যাপি স্থানে স্থানে প্রস্তরময় ভিত্তি ও প্রশস্ত জলাশয়ের চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

সেকালে প্রত্যেক রাজপ্রাসাদ এক-একটী স্বতন্ত্র দুর্গবিশেষ ছিল এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে অতি প্রশস্ত সেনানিবাস থাকিত। সেনাগণের ভরণপোষণের জন্য দুর্গপ্রাঙ্গণে বৃহৎ বৃহৎ গোলা বা শস্যাগারে অপরিমিত ধান্যাদি শস্য সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকিত। শত্রু দেশ আক্রমণ করিলে প্রধান প্রধান প্রজা দুর্গের ভিতর সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিত, এবং রাজ্যের নানা স্থান হইতে বৃত্তিভোগী পদাতিক সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রাজপরিবারের রক্ষার জন্য দুর্গে সমবেত হইত। এই সকল কারণেই প্রজা ও সৈন্যসামন্তের আহার্য্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বদা রাজ-দুর্গের অভ্যন্তরে সঞ্চিত থাকিত। কেশরীবংশীয় রাজাদিগের দুর্গের ভগ্নাবশেষ একটী বিশাল ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আজকাল এই স্থানটী কণ্টক গুল্মে সমাকীর্ণ। এই বিরাট ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ এপর্য্যন্ত খনন করিয়া দেখেন নাই। ভগ্নস্তূপ হইতে অনুমান করা যায়, এই স্থানে তৎকালীন সুদৃঢ় প্রস্তরময় প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ আড়ম্বর বা শিল্পকলার উৎকর্ষ ছিল না। যে কেশরী বংশীয়গণ ভুবনেশ্বরের শিব-মন্দিরগুলিকে অজস্র অর্থ ব্যয়ে সুকুমার শিল্পকলায় মণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই অতিসাধারণ বাসোপযোগী প্রাসাদে দিনাতিপাত করিতেন। এদেশে সাধারণ গৃহস্থ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সর্ব্বাপেক্ষা রুচিকর বা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান মনে করেন তাহা দেবতার উদ্দেশেই উৎসর্গ করেন। আজিও মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া গ্রামের প্রান্তে একটী প্রস্তরময় শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পরলোকের পাথেয় সংগ্রহ করেন। এই ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই কেশরী বংশীয়গণ রাজকোষ নিঃশেষ করিয়াও শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিতেন, এবং নিজ নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যৎসামান্য অর্থ ব্যয় করিতেন। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের সমস্ত কার্য্যই নিয়ন্ত্রিত করিতেন।

কেশরীবংশের সর্ব্বপ্রথম রাজা যযাতি কেশরী যাজপুর নগরের পত্তন করিয়া যান। পরে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে যাজপুর কেশরীবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী হয়। যখন চীনপরিব্রাজক হুয়েঙ্‌সাঙ্‌ উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন, তখন যাজপুর উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। যযাতি কেশরী অযোধ্যাপ্রদেশ হইতে দশ হাজার বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া যাজপুরে তাঁহাদের বাসোপযোগী ভূমি দান করেন। আজিও সাতটী স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণশাসন অযোধ্যা হইতে আগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই সকল ব্রাহ্মণ শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের বিদ্যার প্রভাবে ও জ্ঞানের গরিমায় যাজপুর আলোকিত হইয়াছিল; এখনও যাজপুর উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র। যাজপুরের অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণগণ আজিও উড়িষ্যার ব্রাহ্মণসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। কেশরীবংশের অভ্যুত্থানের সহিত উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। যাজপুরের ব্রাহ্মণগণ সেই পুনরুত্থানের অগ্রদূত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে বিদ্যা ও সদাচারের প্রভাব এখনও কথঞ্চিৎ বিদ্যমান আছে। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে অগ্নিকুণ্ডে যাগযজ্ঞ করিতেন, আজিও সেই অগ্নিকুণ্ডের প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নি আর্য্যসভ্যতার গরিমা দিক্‌দিগন্তরে প্রচারিত করিতেছে। প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের দর্শনবাদের সহিত কর্ম্মকাণ্ডবহুল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংঘাত নিবারণ করিবার জন্য বোধ হয় যযাতি কেশরী ভুবনেশ্বরে ব্রাহ্মণশাসন স্থাপন না করিয়া সুদূর যাজপুরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের অতি সন্নিকটে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি পর্ব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের পীঠস্থান ছিল, এবং বহুবর্ষ সাধনার ফলে ভুবনেশ্বরের অধিবাসিগণ বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। যাজপুরের চতুষ্পার্শ্বে বৌদ্ধদিগের কোন কীর্ত্তিস্তম্ভ ছিল না। যাজপুরের ব্রাহ্মণশাসনসমূহে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হইতে রক্ষা পাইয়া দুই-এক শতাব্দীর মধ্যে নিজ শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শত শত শিবমন্দির এক সময়ে বৈতরণী নদীর উভয় কূলে বিদ্যমান ছিল। শিব-শক্তির সংযোগ হইতেই সৃষ্টির কল্পনা হইয়াছে, ইহাই শাক্ত ও শৈবদিগের বিশ্বাস। শৈবধর্ম্মের সহিত যাজপুরে শাক্তধর্ম্মের প্রভাবও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। 'বিরজা' যাজপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার দর্শনের জন্য অদ্যাপি বহুদূর হইতে অসংখ্য তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। বারুণীগঙ্গা স্নানের দিন বৈতরণী স্নানের উপলক্ষে যাজপুরে একটী বাৎসরিক মেলা হয়। বিরজাদেবীর মন্দির অতি প্রাচীন ও কারুকার্য্য-খচিত। ইন্দ্রাণী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কুমারী, যমমাতৃকা, কালী ও রুদ্রাণী এই সপ্তমাতৃকার সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি যাজপুরে রহিয়াছে। লোকের বিশ্বাস, বিরজা দর্শন করিয়া বৈতরণী নদী পার হইলে পরকালে যমালয়ের পথে তপ্ত বৈতরণী পার সহজসাধ্য হয়। অরুণস্তম্ভের অনুরূপ একটী সুবৃহৎ নীল প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ বিরজাদেবীর মন্দিরে যাইবার পথিমধ্যে বিদ্যমান আছে। উহা যযাতি কেশরী দ্বারা যাজপুর নগর সংস্থা-

পন কালে নির্ম্মিত শুভস্তম্ভ বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্তম্ভের উপরিস্থিত গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি কিয়দ্দূরে পতিত এবং স্তম্ভের শীর্ষভাগে সন্নিবেশিত প্রস্তরখণ্ড কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুত হইয়াছে। স্তম্ভের নিম্নভাগে দুইটী বৃহৎ ছিদ্রও দেখা যায়; প্রবাদ, কালাপাহাড় রজ্জুসংযোগে হস্তী দ্বারা স্তম্ভটী ভূপাতিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় স্তম্ভটী পতিত হয় নাই; কেবল গরুড়ের মূর্ত্তিটী স্থানভ্রষ্ট হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

যাজপুরের শাসনী ব্রাহ্মণগণ রাজানুগ্রহে উড়িষ্যার হিন্দুসমাজকে নিয়ন্ত্রিত ও বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উচ্চাদর্শের প্রভাবে লোকে সদাচারের অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছিল; ব্যভিচারে ও কদাচারে আসক্ত হইয়া উচ্চ বর্ণাশ্রয়ী ব্যক্তিগণ নিম্নশ্রেণীর সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। সমাজের বর্ণাশ্রমের যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। রাজানুগ্রহে ও নিজ নিজ চরিত্রবলে শাসনী ব্রাহ্মণগণ উড়িষ্যায় বর্ণাশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ অনেকেই পুনরুত্থিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব মানিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু স্থানে স্থানে আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণগণ নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজের অনুশাসন মানেন নাই। তাঁহাদের বংশধরগণ আজিও পতিত ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। সারুয়া, হলুয়া, সাহু ও ভাহু প্রভৃতি নামে অভিহিত বলরাম-গোত্রীয় ও মাস্তান ব্রাহ্মণেরা ঐ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া অনুমান হয়। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলেও তাঁহারা দেশের অন্যান্য কৃষিজীবীর ন্যায় দিনাতিপাত করিয়া থাকেন, এবং নিজ হস্তে হলচালন করিতে তাঁহারা কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করেন না। গঞ্জাম জেলায় সাহু ও ভাহু নামক পতিত ব্রাহ্মণ দেখা যায়। সাহু ব্রাহ্মণগণ মুদিখানার দোকান করিয়া থাকেন এবং ভাহু ব্রাহ্মণগণ তামাকের চাষ করিয়া দিনাতিপাত করেন। বলা বাহুল্য উড়িষ্যার পতিত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বা শাস্ত্রচর্চ্চা নিতান্ত বিরল। তাঁহারা অতীতের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য বোধ হয় নামমাত্র উপবীত গ্রহণ করিয়া আছেন; কিন্তু নবোত্থিত হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সময় তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় অদ্যাপিও পাতিত্যদোষে দূষিত। পৈতৃক উপজীবিকা ছাড়িয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনা যজন-যাজন প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে মনোনিবেশ করেন নাই বলিয়াই সমাজের নিম্নতম স্তরে তাঁহারা এখনও নিমজ্জিত রহিয়াছেন। কেশরীবংশীয় রাজগণ শাসনী ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মকে দেশব্যাপী ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অসিবলে কোন দিন বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিতে প্রয়াস পান নাই। চীনপরিব্রাজক হুয়েন্‌সাঙ্‌ যখন উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন, তখন হিন্দু ও বৌদ্ধগণ বিদ্বেষভাব পরিবর্জ্জন করিয়া স্বাধীনভাবে নিজ নিজ উপাসনা করিতেন। বর্ত্তমান উড়িষ্যার হিন্দুসমাজ গুণকর্ম্মবিভাগের ছায়ায় ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভক্ত হইয়াছে। কেশরীবংশীয়গণ বর্ণাশ্রমবর্জ্জিত বৌদ্ধভাবাপন্ন জনগণকে শাসনী ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবে জাতিবিভাগে বিভক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে হিন্দু রাজশক্তির তিরোভাবে হিন্দুসমাজ কাণ্ডারীহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং জাতিগত পার্থক্য 'অচল আয়তনে' পরিণত হইয়াছে। উড়িষ্যার স্বাধীন রাজগণ যোগ্যতা দেখিয়া নিম্নজাতীয়দিগকে উচ্চ জাতির সুযোগ প্রদান করিতেন এবং রাজানুজ্ঞায় তাঁহারা সামাজিক বিষয়ে উচ্চ জাতির সমকক্ষ হইতে পারিতেন। পুরীর স্বাধীন রাজগন স্থলবিশেষে নিম্নজাতীয়কে উচ্চজাতীয়, এমন কি ব্রাহ্মণেও পরিণত করিতেন। গড়জাতের রাজগণ আজিও নিম্নজাতীয়কে কখন কখন উচ্চ জাতিতে পরিণত করিয়া গুণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন।

কেশরীবংশের মরকত কেশরী বা মতান্তরে মর্কট কেশরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ৯৫৩ হইতে ৯৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কটক নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন এবং নগরটীকে মহানদীর বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার তিন দিকে বিশাল প্রস্তরময় বাঁধ নির্ম্মাণ করেন; সেই বাঁধ আজিও বিদ্যমান আছে। অবশ্য মোগল, মারহাট্টা ও ইংরাজগণ সেই বাঁধের জীর্ণ সংস্কার এবং স্থানে স্থানে পুনর্গঠন করিয়াছেন। এই বাঁধকে কেশরীবংশের পূর্ত্তবিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যাইতে পারে। পুরীর অনতিদূরে 'আঠারনালার' প্রস্তরময় সেতু এই সময় নির্ম্মিত হয়। প্রস্তরের উপর প্রস্তর গাঁথিয়া দুইটী স্তম্ভের ঊর্দ্ধ দিক ক্রমশঃ প্রসারিত করিয়া মধ্যস্থলে সংযোজিত করা হইয়াছে। বোধ হয় সে সময়ে স্থপতিগণ খিলান করিবার প্রণালী জানিতেন না; কিন্তু তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়া এই সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাতে সেতুর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবার সম্ভাবনা বিরল। কারণ খিলানের অর্দ্ধেক অংশ পড়িয়া গেলেও অপরার্দ্ধ স্থানভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই।

মহর্ষির সাম্বৎসরিক।

উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ এসো, সকলে মিলিত হয়ে একপ্রাণে সেই রসস্বরূপ ব্রহ্মনামের জয়ঘোষণা করে জীবনকে সার্থক

করি। আমরা সংখ্যায় অল্প হ'লেও আমাদের হৃদয় হতে নিরানন্দ ও নিরাশা বিদূরিত হোক, আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজের দেবতা কেবল আজ নয়, চিরকালই আমাদের সঙ্গে আছেন। বিশ্বাস কর—তিনি জাগ্রত দেবতা। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে মহান পুরুষের অনন্তভাব আমাদের সম্মুখে ধারণ করছেন, বিশ্বাস কর—তিনি আমাদের নিত্যসাক্ষী। নিরানন্দ দূরে পরিত্যাগ করে সকলে আশান্বিত হও—সত্যের জয় হবেই, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হবেই। আজ মূর্ত্তিপূজা উপধর্ম প্রভৃতির বৃথা আড়ম্বর কোলাহলের পরিবর্ত্তে শান্তস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা দেশবাসীর হৃদয় অধিকার করতে চলেছে। ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তখন কে বা জানত যে, দূর-দূরান্তরে, সুদূর পল্লীগ্রামে, লোকালয়শূন্য প্রান্তরের মধ্যে ব্রহ্মপূজা প্রতিষ্ঠিত হয়ে শত শত নরনারীর অন্তরে নবজাগরণ এনে দেবে? এই ব্রাহ্মসমাজই পরমেশ্বরের মঙ্গলভাবের জলন্ত পরিচয় প্রদান করছে। এই ব্রাহ্মসমাজ, আমাদিগকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, অনন্তমঙ্গল সত্যস্বরূপ ভগবানের রাজ্যে অমঙ্গলের প্রতিষ্ঠা নেই, অসত্যের প্রতিষ্ঠা নেই।

আমাদের আত্মাতে এই মঙ্গল আশাবাণী নিত্যই শ্রবণ করছি যে, যতই সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম—জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা জগতে প্রতিষ্ঠিত হবে, ততই জগতে মঙ্গলের রাজ্য বিস্তৃত হবে। জগতে মঙ্গলের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হওয়াই ঈশ্বরের একমাত্র ইচ্ছা। আমাদের কর্ত্তব্য, আমরা সকলে তাঁর ইচ্ছার অনুকূলে গিয়ে, আমাদের সকলের ইচ্ছা তাঁর মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত করে জগতের মঙ্গলসাধনে রত হই এবং নির্ভীক হৃদয়ে ব্রহ্মোপাসনা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করি। ব্রহ্মোপাসনা সুপ্রতিষ্ঠিত হলে কেবল আমাদের প্রত্যেকের নয়, আমাদের পুত্র-পৌত্রাদিরও মঙ্গল সাধিত হবে; আমাদের সকলের কেবল ঐহিক নয়, অনন্তকালের জন্য পারত্রিক মঙ্গল লাভ হবে।

চন্দ্রতপন যাঁর আরতি করছে; দেবমনুষ্য একপ্রাণে যাঁর চরণবন্দনা করছে; সর্ব্বভূতের একমাত্র আশ্রয় সেই পরমাত্মাকে তাঁর এই জগতমন্দিরে এবং এই উপাসনামন্দিরে বিদ্যমান দেখ, জাগ্রত জীবন্তভাবে উপলব্ধি কর। হৃদয়কে প্রশস্ত কর, আত্মাকে উন্নত কর। আজ সেই আনন্দস্বরূপের সহবাসজনিত বিমলানন্দ উপভোগ করে পরিতৃপ্ত হও। সেই মহান পুরুষ আমাদের শরীরে বল দিন, মনেতে উৎসাহ দিন, আত্মাতে শক্তি দিন, যাতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম আমরা দেশে দেশে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে প্রচার করে জগতে এক সুবিশাল ও দৃঢ়ভিত্তি ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হই। তিনি আমাদের এই প্রার্থনা সফল করুন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দান।

জগতে যখন ধর্ম্ম বড়ই ম্লানভাব ধারণ করে, জনসাধারণ যখন প্রকৃত মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আপাত সুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, স্বার্থে অন্ধ হইয়া যায়, ক্ষণিক সুখের জন্য পাপপ্রবৃত্তিসমূহকে প্রশ্রয় দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না, সেই সময়ে এক এক মহাপুরুষ ভগবানের শক্তি ধারণ করিয়া সংসারে অবতীর্ণ হন এবং ধর্ম্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। জনসাধারণ বিচারপূর্ব্বক যদি সেই সকল মহাপুরুষদিগের প্রচারিত সত্যসকল অবলম্বন করে, তবে জগতে উন্নতির বিলম্ব হয় না। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায় যে, মহাপুরুষের জীবনকালে আমরা তাঁহার মহত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি না—তাঁহার তিরোভাবের পরে তাঁহার অভাব যখন আমাদিগকে প্রতি পদে আঘাত করিতে থাকে তখনই তাঁহার মহত্ত্ব আমরা অনেকটা উপলব্ধি করি। তখনই আমরা সেই মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব কোন্‌খানে তাহার সন্ধান করিয়া তাহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহারই পদানুসরণে অগ্রসর হই। এই সন্ধান করিতে গিয়াই আমরা স্বভাবতই দেখিতে চাই যে, মহাপুরুষ জগতে কোন্ বিশেষ দান দিয়া গিয়াছেন। এইরূপ সন্ধান আমাদিগকে বিশেষ লাভবান করে, ধর্ম্মপথে অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দেয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

একদিন যখন দেশের এইরূপ দুর্দ্দিন আসিয়াছিল, সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় ভগবানের শক্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং অন্ধকারাবৃত শতবিধ আগাছায় পূর্ণ অরণ্য পরিষ্কৃত করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল সার্ব্বভৌমিক মহা সত্যের বীজ প্রোথিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই বীজ তখন প্রথম পরিষ্কৃত ভূমিতে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সেই সত্যের বীজ মরে নাই, বিনষ্ট হয় নাই। অবশেষে যথাসময়ে, আজ যাঁহার তিরোভাবের দিন, ব্রহ্মোপাসকেরা যাঁহার নামে বিভিন্ন স্থানে স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান করিয়া যাঁহার পুণ্যস্মৃতি অন্তরে সযত্নে পোষণ করিতেছেন, সেই পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রামমোহন রায়-প্রোথিত সেই বীজ অবলম্বনে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইতে আরও দুইটী মহাসত্যের সন্ধান লাভ করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই দুইটী মহাসত্য আমাদের জন্য দিয়া গিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ যে দুইটী মহাসত্য আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী হইতেছে—ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাধনে যে প্রত্যেক মানবাত্মার স্বাধীনতা

আছে, সেই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বোধ জনসাধারণের অন্তরে জাগাইয়া তোলা। দেবেন্দ্রনাথের এই দানের গুরুত্ব, তাহার অনন্যসাধারণত্ব এখন আমাদের উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাই নাই। এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার কথা ভারতে কিছু নূতন নয়—উপনিষদের বলিতে গেলে ছত্রে ছত্রে এই স্বাধীন ভাবের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশেষে উপনিষদের ঋষি এই স্বাধীন ভাবের উচ্ছ্বাসে ঘোষণা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না যে, অধীনতা যদি স্বীকার করিতে হয় তো ব্রহ্মবিদ্যারই নিকটে করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন বেদ-বেদাঙ্গ আর যে কোন বিদ্যা আছে, কাহারও চরণে হৃদয়ের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হইবে না, কারণ একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ প্রভৃতি আর সমস্তই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ঋষি খুবই জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন—"অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি—অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। সম্ভবত নানা বিপ্লবের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে ভারতের এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, সহজ সত্যকে সরল ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে বর্ত্তমান যুগে রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথম সেই ভস্মস্তূপের অন্তরাল অপসারিত করিবার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তিনি যুগযুগান্তসঞ্চিত সেই স্তূপীকৃত ভস্মরাশির অনেকটা অপসারিত করিলেও সম্পূর্ণরূপে সরাইয়া দিতে সক্ষম হন নাই—অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে ধারণ করিতে পারেন নাই। রাজা রামমোহন রায়ও শাস্ত্রবাদের হাত সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ভগবৎবিধানে এই কার্য্যকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার ভার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরই উপরে সন্ন্যস্ত হইল। তিনি বেদাদি আলোচনার ফলে যখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, 'দেশকাল-অবস্থানির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীরই ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার আছে,' এবং যেদিন তিনি এই সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া দিলেন, সেই দিনই বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রথম প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক পরাধীনতার মূলোচ্ছেদ করা হইয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে এই বিষয়ের যে ইতিহাসটুকু সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে অল্প একটু এখানে বলিতেছি—"আমরা উপনিষদের উপদেশে জানিলাম, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, এ সকলই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, আর যাহা দ্বারা পরব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এই কথা আমরা অতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম। আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে এ কথার খুব মিল হইয়া গেল। আমাদের সেই লক্ষ্য সাধারণের নিকট ঘোষণা করিবার অভিপ্রায়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ হইতে তাহার শিরোভাগে এই বেদবাক্য প্রকাশ করিতে লাগিলাম। * * * যখন আমরা ইহা দ্বারা বুঝিলাম যে, বেদের মধ্যে দুই বিদ্যা আছে, পরা বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা, তখন অপরা বিদ্যার বিষয় কি এবং পরা বিদ্যারই বা বিষয় কি, তাহা বিস্তার রূপে জানিবার জন্য বেদের অনুসন্ধানে উৎসুক হইলাম। * * * এইক্ষণে এই নিশ্চয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, বেদে অপরা বিদ্যার বিষয় কেবল দেবতাদিগের যাগযজ্ঞ। * * * অতএব কর্ম্মকাণ্ডের পোষক যে বেদ, তাহা দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল। * * * কিন্তু প্রাচীন ঋষিদেরও আত্মা যে কেবল এই অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি পরিমিত দেবতার যাগযজ্ঞ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল, তাহাও নয়। তাঁহাদের মধ্যেও জিজ্ঞাসা হইল যে, এই দেবতারা কোথা হইতে আইলেন? তাঁহাদের মধ্যে সৃষ্টির প্রহেলিকা লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। * * * ঋষিরা যখন এই সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা শান্তিহীন হইয়া বিষাদ অন্ধকারে মুহ্যমান হইলেন। তখন তাঁহারা স্তব্ধ হইয়া একাগ্রমনে জ্ঞানময় তপঃসাধনে রত হইলেন। তখন দেবদেব পরম দেবতা সেই একাগ্রমনা স্থিরবুদ্ধি ঋষিদিগের নির্ম্মল হৃদয়ে আপনি আবির্ভূত হইয়া মন ও বুদ্ধির অতীত সত্যের আলোক প্রকাশ করিলেন। * * * আশ্চর্য্য যে, উপনিষদের যে সকল মহাবাক্য, তাহা সেই প্রাচীন বেদেরই মহাবাক্য—সেই সকল বাক্যেতেই উপনিষদের মহত্ত্ব হইয়াছে। উপনিষদে যে আছে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", উপনিষদে যে আছে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া"—এ সকলই ঋগ্বেদের বাক্য—ঋগ্বেদ হইতে উপনিষদে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। বেদের যদি আর সকলই লোপ পায়, তবু এই সকল মহাবাক্যের কখন লোপ হইবে না। * * * এই বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য, তাহা লইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম সংগঠিত হইল এবং আমার হৃদয় তাহারই সাক্ষী হইল। বেদরূপ কল্পতরুর অগ্র শাখার ফল এই ব্রাহ্মধর্ম্ম।"

এই স্বাধীনতালাভের ইতিহাস লিখিতে শুনিতে এতটুকু হইলেও ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা বর্ত্তমানে অসম্ভব, কেন না আমরা শৈশবাবধি এই স্বাধীনতারই ভিতরে লালিত। যিনি এই স্বাধীনতা বিঘোষিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের অবস্থার পরিমাপে তাঁহার হৃদয়ের স্বাধীনতা পরিমাণ করা সম্ভব নয়। সে সময়ে, এক দিকে

হিন্দুসমাজে যদি বা কেহ মনে মনে পৌরোহিত্য, গুরুগিরি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পরাধীনতার ভাব অতিক্রম করিয়া স্বাধীনভাবে ভগবানের সঙ্গে মানবের প্রত্যক্ষ যোগসাধনের অধিকার উপলব্ধি করিতেন কিন্তু প্রকাশ্যে সে বিষয় ব্যক্ত করা তাঁহার সাহসে কুলাইত না। অপর দিকে, অন্যান্য ধর্ম্মের প্রচারকেরা হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু, সমস্তই চূর্ণবিচূর্ণ করিবার জন্য অহর্নিশি নব্য যুবকদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। এই উভয়বিধ পরাধীনতার করাল কবল হইতে যিনি ভগবৎপ্রসাদে এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিকে রক্ষা করিয়া সংযত স্বাধীনতা দিতে সক্ষম হইয়াছেন, আজ আমরা তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মহান্ দান হইতেছে—ব্রাহ্মধর্ম্মের অথবা সমস্ত প্রকৃত সত্যধর্ম্মের উদারতম, সবলতম ও সরলতম এই বীজমন্ত্র—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—তাঁহাকেই প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করাই তাঁহার একমাত্র উপাসনা এবং এই প্রকার উপাসনা দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। এই মন্ত্রটী এখন আমাদের নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু যে সময়ে এই মন্ত্রটী বাহির হইয়াছিল, সে সময়ে ঐ মন্ত্রটী জনসাধারণের নিকট স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রতীত হয় নাই—এমন কি, এত সংক্ষেপে ব্রহ্মোপাসনার মূলমন্ত্র যে প্রকাশ করিতে পারা যায়, তাহা কাহারও অন্তরে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এই ভাবটী সম্পূর্ণ নূতন নহে। এই ভাব সকল ধর্ম্মের মধ্যে, সকল শাস্ত্রের ভিতর ন্যূনাধিক পরিমাণে বিক্ষিপ্ত ছিল এবং আছেও। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র সকলেরই ভিতর মোটের উপর এই ভাব ওতপ্রোত হইয়া আছে। কেবল এ দেশের শাস্ত্র কেন, সকল দেশের সকল শাস্ত্রেরই ভিতর এই ভাব আছে। এই ভাব না থাকিলে কোন ধর্ম্ম দাঁড়াইতেই পারে না, কোন শাস্ত্র শাস্ত্রনামের যোগ্যই হইতে পারে না।

কেবল প্রাচীন ধর্ম্ম বা প্রাচীন শাস্ত্র কেন, এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী যদি আলোচনা করিয়া দেখি, তবে তাহারও স্থানে স্থানে ঈশ্বরপ্রীতি ও মানবপ্রীতি ধর্ম্মের মূল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে দেখি। কিন্তু ঈশ্বরপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনকে কোথাও ধর্ম্মের বীজ মন্ত্ররূপে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইতে দেখি না। সার্ব্বভৌমিক সত্যসকল তো চিরকালই আছে—দেশকাল-অবস্থা-নির্ব্বিশেষেই আছে। কিন্তু মহাপুরুষদিগের কাজ হইল প্রয়োজনমত সেই সকল সত্যের মধ্য হইতে এক বা একাধিক সত্য বাছিয়া লইয়া দেশকাল-অবস্থা বিশেষে উপযুক্ত আকার-প্রকার দিয়া জনসাধারণের নিকট বোধগম্যরূপে প্রকাশ করা। ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করি না যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রকাশিত বীজমন্ত্রের সূত্র রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী হইতে পাইয়া থাকিবেন, কিন্তু সত্যধর্ম্মের বীজমন্ত্র সংযত আকারে পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করিবার সক্ষমতাতেই তাঁহার বিশেষত্ব। বর্ত্তমান যুগে তিনি এই মন্ত্র প্রকাশ না করিলে কত সুদীর্ঘ কাল ব্যবধানে যে উহা প্রকাশ পাইত, তাহা কে বলিতে পারে? মহর্ষি তাঁহার আত্মজীবনীতে এই বীজমন্ত্র প্রকাশ করিবার যে পদ্ধতি ব্যক্ত করিয়াছেন, সেটী বাহিরের পদ্ধতি; তাঁহার অন্তরে সত্যধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ না পাইলে তাঁহার হৃদয়ে এই বীজমন্ত্র আবির্ভূত হইত কি না সন্দেহ। আমি খুবই নিশ্চয় সহকারে বলিতে পারি যে, বৈদিক ঋষিরা যেমন ধ্যানস্থ হইয়াই অধ্যাত্মরাজ্যের অপূর্ব্ব সত্য সকল লাভ করিয়াছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও সেইরূপ ধ্যানস্থ হইয়াই ব্রহ্মোপাসনার মূলতত্ত্ব, সত্যধর্ম্মের এই বীজমন্ত্র দৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আত্মজীবনীতে তিনি বলেন—"তন্ত্র, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, কোথাও ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল, ব্রাহ্মদিগের পত্তনভূমি দেখা যায় না। আমি মনে করিলাম যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের এমন একটা বীজমন্ত্র চাই যে, সেই বীজমন্ত্র ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল হইবে। ইহাই ভাবিয়া আমি আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি পাতিয়া দিলাম। বলিলাম—আমার আঁধার হৃদয় আলো কর, তাঁহার কৃপায় তখনই আমার হৃদয় আলোকিত হইল। সেই আলোকের সাহায্যে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী বীজ দেখিতে পাইলাম, অমনি একটী পেন্‌সিল দিয়া সম্মুখের কাগজখণ্ডে তাহা লিখিলাম এবং সেই কাগজ তখনি একটা বাক্সে ফেলিয়া দিলাম ও সেই বাক্স বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া রাখিলাম। * * * এক বৎসর পরে তাহা আমি বাক্স হইতে বাহির করি। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে, এই বীজ সারগর্ভ। * * * এই বীজ প্রকাশ হওয়ার পর দেখি যে, সকল ব্রাহ্মেরই ইহাতে সম্মতি, সকলেরই ইহাতে সন্তোষ। ইহাতে অদ্য পর্য্যন্ত কাহারও আপত্তি হয় নাই। যদিও ব্রাহ্মসমাজ বহুধা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদে এই বীজমন্ত্র সকল ব্রাহ্মেরই একমাত্র ঐক্যস্থল হইয়া রহিয়াছে।" ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে একজন নিষ্ঠাবান চিন্তাশীল ব্রাহ্ম বক্তৃতাতে এই বীজমন্ত্রের প্রশংসায় যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা সর্ব্বান্তকরণে তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি যে, "পৃথিবী মধ্যে যে পর্য্যন্ত সত্যের সমাদর থাকিবে, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের হৃদয়-সিংহাসনে

বিবেকরাজার অধিষ্ঠান থাকিবে, যে পর্য্যন্ত বিশ্বরাজ্যের বিলয়দশা উপস্থিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত উহা মানব-প্রকৃতিকে অবশ্যই বিভূষিত করিবে, সন্দেহ নাই।"

বঙ্গদেশের, সমগ্র ভারতভূমির সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার ও উন্নতির পথ যিনি সর্ব্বপ্রথম উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন, সেই রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি যদি আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অগ্রসর হই, ভারতের নিজস্ব ব্রহ্মোপাসনাকে যিনি বর্ত্তমান যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি যদি আমরা শ্রদ্ধাভক্তি জানাইতে চাই, তবে আমাদের কর্ত্তব্য যে একদিকে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখি, এবং অপর দিকে ব্রহ্মোপাসনার বীজমন্ত্র অন্তরে ধারণ করিয়া সত্যসত্য তাহার সাধনা করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে জয়যুক্ত করি। ব্রাহ্মসমাজকে সযত্নে রক্ষা করিলে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিবার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলে কেবল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষদিগেরই প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শিত হইবে না, কিন্তু এই সত্য ঋষিবাক্য জানাইতেছি যে, ইহার ফলে আমাদের প্রত্যেকের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হইবে, এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে।

নারীমঙ্গল।

(গাথা)

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন কাব্যবিশারদ)

(৯৬ ব্রাহ্মসম্বৎ, ৯ই মাঘ রামমোহন লাইব্রেরিতে বিবৃত)

গীত

প্রাচীনতমা প্রাচ্যমহিমা পাবনী পুরাণী বাণী,
জাগো জাগো হৃদয়ে হৃদয়ে নিখিল জ্ঞানের রাণী।
দূর অতি দূর, অতীত স্মৃতি
বিশ্ব-মানব-মানস-গীতি
এস বাহিরিয়া ধরিয়া মুরতি, লউক তোমারে মানি'।
নূতন পূজারি মন্দিরদ্বারে
এসেছে পূজিতে নব উপচারে
করুণ-নয়নে চাহগো তারে মঙ্গলাশীষ দানি'।
কর কৃতার্থ নবীন সাধনে
পুলকিত কর সাধু-সুজনে
স্তম্ভিত কর নিখিল ভুবনে নবীন বারতা আনি'।
পুরাতনে আজি নূতন বলিয়া
লইবে সকলে দ্বন্দ্ব ভুলিয়া
লবে শিরে তুলি নবীন পূজারি-পূজিত চরণ দু'খানি।

যাঁহার শক্তি হৈমবতী উমারূপিণী নারীমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া দেবগণের অসুরবিজয়-সঞ্জাত পৌরুষের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছিলেন; আজ এই ব্রাহ্মীশ্রীসমন্বিত সন্ধ্যাকালে সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"কে বার বার প্রণাম করি। তাঁহারই প্রসাদে নিখিল নারীজাতির ভিতরে সেই শক্তি উদ্বুদ্ধ হউক।

গীত

রঞ্জি' পূরব দিগ্বিভাগে, জাগে অরুণ তরুণ রাগে
জাগে ধরণী নবানুরাগে অরুণবরণী
জাগো জাগো ব্রহ্মবিদ্যা জননী।
হাসি সুহাসি তামসী নাশি'
বিতরি' বিশ্বে কিরণরাশি
আয়াহি বরদে দেবি ওঁ ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী।
দেহ মা জ্যোতিঃ দেহ মা প্রাণ
দেহ মা শক্তি দেহ মা জ্ঞান
প্রাণ-পীযূষ করায়ে পান জাগো মা মরণহরণী
প্রথম জগতে প্রথম ঋষির আহ্বানভূতা জননী।
কোটি রবি-শশী-করাহুলিপ্তা
পরম ব্রহ্মতেজদৃপ্তা
আর্য্য-ঋষি-বিবুধসেবিতা স্মের-সবিতা-বদনী।
জাগো প্রাণে নয়নে বচনে
জাগো ধ্যানে শ্রবণে মননে
জাগো চেতন-চিরনিকেতনে চেতনারমণী।

সেই আদিমযুগে—বিশ্বসৃষ্টির শৈশবকালে যে ব্রহ্মবিদ্‌গণ সেই "অবাঙ্মনসগোচরম্"কে কেবল পুরুষরূপেই উপলব্ধি না করিয়া বুঝিয়াছিলেন "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি" আজ এই পুণ্যবাসরে তাঁহাদের চরণে বার বার শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করি।

আজ এই যুগান্তপ্রভাতে,—সঙ্কীর্ণ-সমাজের গণ্ডীবদ্ধ কাপুরুষতার দিনে সেই উদার আর্য্য ঋষিগণের চরণে প্রণাম করি, যাঁহারা বলিয়াছেন—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥"

গীত

সে কোন্ কাণা বিধি গড়েছিল
জগতে এই নারীগণে
বুঝি এক চোখে সে দেখেছিল
পুরুষে কোন্ শুভক্ষণে;
পেলে তাঁরে জেনে নিতাম,
কেন নারী হ'য়ে জনমিলাম
কিসে নারী হয়গো পুরুষ করব তাহা এ জীবনে।
পুরুষের শত দোষে, কলঙ্ক কেউ নাহি ঘোষে
অপবাদ উঠে নারীর কারণে কি অকারণে।
নারী যেন খেলার পুতুল, মালার ঝরা শুকান ফুল,
সাধে পুরুষ নিবে গলে সাধে দলিবে চরণে।

সে জাতি কাপুরুষজাতি,চেনে না রে মায়ের জাতি
মাথা পেতে লয় গো লাথি, বাঁধা শত-বন্ধনে ॥

নমস্য সেই বিবুধবৃন্দ যাঁহারা নারীকে শুধু "কামিনী" রূপে অনুভব করিয়া সংসারযাত্রায় "নরকের দ্বার" রূপে ভাবেন নাই; বরং বলিয়াছেন যেখানে নারীরা পূজিত হন "তত্র রমন্তে দেবতাঃ"।

সেই মহনীয় আর্য্যগণের ভিতরেই মৈত্রেয়ী গার্গী সুলভা জন্মিয়াছিলেন, যাঁহাদের বিধান "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"।

আজ বন্দনীয় সেই মহাকবি বাল্মীকি, যাঁহার ক্রৌঞ্চনিধন-ব্যথিত-চিত্তে করুণধারা বিগলিত হইয়া অমর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—

ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারাস্তিরস্ক্রিয়া।
নেদৃশা রাজসৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়ঃ ॥
ব্যসনেষু ন কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ম্বরে।
ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দুষ্যতে স্ত্রিয়ঃ ॥

এমনি করিয়াই তিনি অবগুণ্ঠনের কুণ্ঠাকে বিড়ম্বিত করিয়া দেখাইয়াছেন—

গীত

হৃদয়খানি খোলা যাহার কাজ কি রে তার আবরণ?
(দেখে) পুণ্যপূত নিখিল ধরা, শুদ্ধ যাহার নিজের মন।
আপনারে যে রাখে গোপন
তার পানে ধায় সবার নয়ন—
জনপূর্ণ ধরামাঝে সঙ্গীবিহীন তার জীবন।
খুলে দাও পরাণখানি
বাইরের আলো টেনে আনি'
ফুলের মতন ফুটে উঠে স্নিগ্ধ কর এ ভুবন।
এই প্রকৃতির বক্ষপুটে
কমল ফোটে কুন্দ ফুটে
পূজার অর্ঘ্য হবার তরে খুলে রাখে রে আনন।
নিখিল-মানব-নয়ন-ময়
সেথাই তাদের উঠছে রে জয়
সেই তো জগৎপতির পূজা সেই তো পাওয়া তাঁর চরণ।

আজ পূজা করি সেই প্রেরিতপুরুষ মহম্মদকে, যিনি তাঁহার জীবনে প্রকাশিত পরম সত্য প্রথমেই প্রচার করিয়াছিলেন খাদিজানাম্নী মহীয়সী নারীর নিকটে। এমনি করিয়াই যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী "কিমহং তেন কুর্য্যাং যেনাহং নামৃতা স্যাং" বলিয়া সহধর্ম্মিণীর পরিচয় দিয়াছেন।

জয় করুণাসাগর যীশুখৃষ্ট! যিনি মন্দিরসমীপে নাগরিকগণবাহিতা তিরস্কৃত রমণীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.

আজ এই নারীলাঞ্ছনার দিনে স্মরণ করি মহাপুরুষ শ্রীশ্রীতথাগতকে যিনি লিচ্ছবিরাজগণের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া অম্বাপালীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আজ এই নারীনির্য্যাতনের বিভীষিকাপূর্ণ জগতে মনে পড়ে সেই ইক্ষ্বাকুকুলপঙ্কজসবিতা শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তি, যিনি অহল্যার অভিশপ্ত জীবন আলোকিত করিতে—"রাঘবস্তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা।"

হে ভ্রমান্ধ সমাজ! আজ এই শুভদিনে অনুভব কর—সংহিতাকারের করুণ হৃদয়, অপূর্ব্ব মহাপ্রাণতা, যাঁহারা বলিয়াছেন—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥"

আর সেই সমাজে আজ বিধবা ও অধবার এত দুঃখ!

গীত

বিধবা হয় না কেবল সাজে—
কেউ বিধবা বাইরে শুধুই
কেউ বিধবা মনের মাঝে।
প্রাণে যার আঁকা প্রেমে পতির মূরতি
সে সতী নয় বিধবা চির আয়ুষ্মতী।
করেছে সে মৃত্যুজয়ী প্রেমে তাঁহার হৃদয়-রাজে।

প্রণাম করি পরাশরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে, যাঁহার তুলিকায় বিদুলার ন্যায় বীর রমণীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। "অবলা" অপবাদগ্রস্ত নারীর মুখ দিয়া তিনি পুত্রের যুদ্ধযাত্রাকালে বলাইয়াছেন—

"অপি পর্ব্বণি ভজ্যেত ন নমেদিহ কর্হিচিৎ।"

গীত।

বীরের জাতির বীরতনয়ে
সাজায় রে বীরজননী;
দেখ্‌লে পরে এ বীর ছবি
নেচে উঠে ধমনী।
এক হাতে তার বরাভয়,
আর এক হাতে কৃপাণ;
গৌরবে তাঁর ভরেছে বুক,
অশ্রুভরা দু'নয়ান।
বাইরে হের কত কঠোর—
প্রাণ যে কোমল নবনী।
(করে) পিতৃগণে বহুমান, দেবগণে গায় যশোগান,
পুলকিত বিশ্বপতি আশীষ করে দান—
স্তম্ভিত বিস্মিত চমকিত অবনী।

সার্থক জনকত্ব সাবিত্রীর পিতা রাজা অশ্বপতির, যিনি সুচারুশিক্ষিতা কন্যাকে বরনির্ব্বাচনের স্বাধীনতা দিয়া বলিয়াছিলেন—

"স্বয়মন্বিচ্ছ ভর্ত্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ।"

বরকন্যার প্রেমোৎকণ্ঠাবশে মিলনই শ্রেষ্ঠ বিবাহ; তাই সাবিত্রী সত্যবানকে দেখিয়াই অনুভব করিয়াছিলেন—

গীত।

কিশোরী-নারী-জীবন-গগনে
পলকে আলোক হানিয়া
এ কোন্ তরুণ অরুণ তারে
যৌবনে দিল রাঙিয়া।
এ কোন্ অতিথি হৃদয়দ্বারে
কি চাহিছে সে যে নয়নাসারে
থেকে থেকে তাঁর বীণার তারে
কি রাগিণী উঠে বাজিয়া।
আমার মাঝারে সে কোন্ রমণী
আছিল ঘুমায়ে দিবসরজনী
পরশে যাদুদণ্ড অমনি
মেলিল নয়ন চমকিয়া—
প্রথম-পুরুষ-দরশ-মুগ্ধ
লাজে মরমে মরিয়া।

কি মধুর সে চিত্র—বৃন্দাবনের সেই নন্দপুরচন্দ্র, যে দিন তিনি মা যশোদার বন্ধন পরিয়া মাতৃজাতির মহিমাকে মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছিলেন,—

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়াঃ বিস্রস্তকবরীস্রজঃ
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে।

গীত।

তারেই বলি মায়ের প্রাণ—
সেই তো বটে মায়ের প্রাণ—
পেটের ছেলে কোলে তুলে, আপন কি পর যায়রে ভুলে,
ছেলের পানে চেয়ে দেখে ছেলেময় ওই জগৎখান।
মা হওয়া কি মুখের কথা, সইতে হবে অনেক ব্যথা—
এক হাতে জল মুছে চোখের, আরেক হাতে স্তন্যদান।
মায়ের হাতে বাজলে কাঁকণ জেগে উঠে সকল সুর,
মায়ের স্নেহে শ্যামল ধরা গন্ধে রসে ভরপুর,
মায়ের হাসি সুধার ধারা, মায়ের কথা কেবল গান।
মায়ের আঁচল ঘিরে ঘিরে আজও গোপাল বেড়ায় ঘুরে
মা-যশোদার বাঁধন পরে' মায়ের জাতির রাখ্‌ল মান।

দিব্যদর্শী পৌরাণিকগণ জগন্মাতার মহিমাকীর্ত্তনের মধ্য দিয়া নারীজাতিকে জাতীয় প্রতীকরূপে কল্পনা করিয়া কহিয়াছেন—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।"

গীত।

ভারত জুড়িয়া গাহো জয়গীতি জয় জয় জয় জননীজাতি
নারী-মহিমা-কীর্ত্তন গানে ফুটিবে আবার নবীন ভাতি
জয় জয় জয় জননীজাতি, জয় জয় জয় জননীজাতি!

অন্নপূর্ণারূপিণী ভবনে,
সঙ্গিনী যারা জীবনে মরণে,
স্নেহে প্রেমে ত্যাগে যতনে গঠিত যাদের মুরতি।
অমল মুখে বিমল হাসি,
নয়নে ক্ষরিছে অমিয়রাশি,
বক্ষে করুণা উঠে উছাসি অঙ্গ ভরিয়া পুণ্য জ্যোতি।
যাহারা দেবী ভকতি-পূজায়
চিরদাসীসমা যতনে সেবায়
মন্ত্রী যাহারা বিপদে সহায়, সখাসম সুখে সতত সাথী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহারই মধ্যে ঈশ্বরের অধিক প্রকাশ—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংঽশসম্ভবম্।"

তাই সমাসের মধ্যে—"দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ", কারণ "উভয়-পদপ্রধানত্বম্ দ্বন্দ্বত্বম্" যথা—মাতা চ পিতা চ=পিতরৌ। সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই প্রধান। এই দুই শক্তিকেই মহাকবি কালিদাস রূপকচ্ছলে বন্দনা করিয়া কহিয়াছেন—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥

সেই মাতাপিতারই প্রতীকস্বরূপ আদর্শ দম্পতী-যুগলকে আজ ভক্তিভরে প্রণাম করি—

গীত।

দাঁড়িয়েছে ঐ যুগল দম্পতী
মরি কি মোহন মূরতি!
কে আছ শান্তিপ্রয়াসী
একবার দেখরে আসি—
কেন আর ঘর ছেড়ে ভাই
বনে গিয়ে হবি সন্ন্যাসী?
ঘরের মান বাড়ায়েছে
ঘর ক'রে সতীপতি।
আনন্দে বলে দীন কবি,
এ ত নয় আর কোনো ছবি।
পতি-পত্নীর মাঝে হের
পুরুষ-প্রকৃতি
(তবে) যেথায় দেখ্‌বে দম্পতী
সেথায় লুটিয়ে কর প্রণতি।

পুরাকালে যে দেশের নারীগণ স্বয়ম্বরে বীর্য্যশুল্কে বিবাহিতা হইতেন, যাঁহারা বীর নায়ক ব্যতীত মনোনয়ন করিতেন না, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর শ্রীরামচন্দ্রের হরধনুর্ভঙ্গ প্রভৃতি যাহার প্রমাণ, যেথানে রুক্মিণী কহিয়াছেন—

"মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য
আরাৎ গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ।"

তুহিনাচলসংস্থিতা ভগবতী শুম্ভনিশুম্ভানুচর সুগ্রীবকে কহিয়াছিলেন—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলং লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

সেই আর্য্যজাতির ভিতরে আজ—

গীত।

এ বড় রকম হোল, এ বড় রকম হোল
এ বড় রকম হোল মিশে গেল নারী-নর।
মাথায় টোপর, চেলী পরণ, বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়
ব্রজের কানু কোথায় লাগে অষ্টাবক্রে হারায়।
চেষ্টা করে' মিহি সুরে ঘোথামাপা বুলি
গোঁপ-কামানো মাথায় টেড়ী চোখে বাঁধা ঠুলি।
এরাই নাকি কোমর বেঁধে করতে যাবে লড়াই
বিরাট রাজার ছেলের মত ঘরেই সাজে বড়াই
হাওয়ায় যারা হেলিয়ে পড়ে জুজুর ভয়ে লাগে ডর।

দিগন্তবিতত বারিধিতীরে ত্রেতাযুগের অগ্নিপরীক্ষিতা সেই আদর্শ সতী সীতা! জলন্ত অগ্নি যাঁহার দেহে ভূষণস্বরূপ হইয়াছিল। মহানাটকের সে কি পবিত্র করুণ মহান্ দৃশ্য!

পদে পাণৌ লাক্ষা, বসনমিব কৌসুম্ভরজনং কটিদেশে,
কেশেষরুণরুচি কহ্লারকুসুমং হরিদ্রামুদ্রাস্যে
* * * কৃশাণুর্বৈদেহ্যা শপথসময়ে ভূষণমভূৎ।

গীত

মরণ হেথায় লভেছে মরণ জয় জয় জয় সতীর জয়,
যেথায় দীপ্ত নারীর মহিমা, কোথায় ভ্রান্তি কোথায় ভয়?
নন্দন-সুধা-পূরিত চিত্ত, অঙ্গে অঙ্গে বিরাজে তীর্থ
বিশ্ব ভরিয়া উঠিছে নিত্য জয় জয় জয় সতীর জয়।
অনলে সলিলে কাননে রণে, রোগে শোকে তাপে ভবনে
সুখে দুঃখে জীবনে মরণে জয় জয় জয় সতীর জয়।
ভূতলে স্বর্গ সতীর স্নেহ, জীবন-মরুর মাঝারে গেহ
উচ্চ কণ্ঠে সকলে গাহো জয় জয় জয় সতীর জয়।

বিশ্বস্রষ্টার মাতৃশক্তিতে নারীর উদ্ভব, মাতৃত্বে নারীর বিকাশ, মাতৃত্বে নারীর সার্থকতা, মাতৃত্বেই নারীর পরিণতি। আজ এই জাতীয় জাগরণের তরুণারুণরাগরঞ্জিত নব প্রভাতে নিখিল নারীজাতিকে অঞ্জলিবদ্ধকরে মাতৃরূপে বন্দনা কর, হে ভারতবাসি ব্রহ্মশক্তিকে অনুভব কর, আর সমস্বরে বল—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"।

গীত

পুণ্য প্রতিমা মাতৃগরবে দাঁড়ায়েছে হের নারী,
সার্থক সব ত্রিদিব বিভব লুণ্ঠিত পদে তাঁরি।
অগণিত কত সূর্য্য-চন্দ্র ঘেরিয়া ঘেরিয়া আরতি করে,
বিশ্ব ভরিয়া উঠে জয়গীতি আনন্দ-ভরে।
অভিনন্দনে দেবতাগণে দাঁড়ায়েছে সারি সারি।
সব রিক্ততা করিয়া পূর্ণ, উজ্জ্বল করি অন্ধকারে।
লালসা বাসনা করিয়া চূর্ণ স্নিগ্ধ করিয়া পীযূষধারে
নারীর নয়নে ক্ষরিছে অমিয়রাশি বচনে শান্তিবারি।
চরণের তলে কোকনদ কত ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিছে রে
অযুত মত্ত মধুপ তাহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলিছে রে
অগণিত কত চাঁদ নিছনি যায় নখমণিছাঁদে হারি।

বেহার ও উড়িষ্যা ব্রাহ্মসম্মিলন।

তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন।

বিগত ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর ১৯২১, গিরিধিতে উক্ত সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। তিন দিনই প্রাতে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল এবং অপরাহ্ণে নানা বিষয়ের প্রসঙ্গ ও আলোচনা হইয়াছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মিলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি যখন সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য আহূত হন, তখন কটক সহর হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেছিলেন। সেখান হইতে মহা অনুরাগ ও উৎসাহ লইয়া আসিয়া তিনি আমাদের সকলের উৎসাহ ও অনুরাগ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল:—

(১) ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য কি কি এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজগুলির মিলনের ভূমি কোথায়?

মহর্ষিদেব নিম্নলিখিত সত্যগুলিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ বলিয়াছেন, যথা,—

১। পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

২। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

এই সত্যগুলিই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য। ইহাদের সহিত পঞ্চম বীজরূপে ইহাও গ্রহণ করা উচিত যে,

প্রত্যেক নরনারীর সাক্ষাৎ ভাবে ভগবানের পূজা করিবার সমান অধিকার।

এই সকল সত্য গ্রহণ ও সাধনই ব্রাহ্মদিগের মিলনের ভূমি। মিলিত উপাসনা এবং মিলন সম্বন্ধে আলোচনা বড় প্রয়োজন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, তিন সমাজের লোক মিলিয়া একটী সেবাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। একটা সেবার কেন্দ্র থাকা উচিত। এখনও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সেবার কাজ কিছু কিছু চলিতেছে, কিন্তু এই সকল কাজ মিলিত ভাবে হওয়া কর্ত্তব্য।

(২) ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় জাগরণে ব্রাহ্মসমাজের স্থান কোথায়? এ সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল :—

এক সময়ে সকল ভাল কাজেই ব্রাহ্মসমাজ অগ্রণী ছিলেন। এখন আমরা চালক তো নই-ই, চালিতও নহি। এখন শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সকল সমাজের লোকই কাজে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে ভগবানের স্থান নাই। যাঁহারা যাহা কিছু ভাল কাজ করিতেছেন, ব্রাহ্মগণ তাঁহাদেরই সহিত যোগ দিবেন—কিন্তু ভগবানের দিকে তাকাইয়া ও তাঁহার ইঙ্গিতে। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, মহর্ষি বলিয়াছেন, আমাদিগকে ছোট হইয়া বড় হইতে হইবে। আমরা সংখ্যায় অল্প হইয়াও আদর্শে বড়। ব্রহ্মই আমাদের কেন্দ্র। আমরা সে কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইব না।

(৩) ব্রাহ্মসন্তানগণের ধর্ম্মশিক্ষা। এ বিষয়ে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইল :—

খুব ভাল পরিবারের ছেলেকেও খারাপ হইয়া যাইতে দেখা যায়। আবার ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে। তাহাদের কাছে এমন সব কথা বলা উচিত নয়, যাহা তাহারা ধরিতে পারে না। তাহাদের উপযোগী করিয়া উপাসনাদি করা উচিত এবং তাহাদের সঙ্গে খুব মেশা উচিত ও ভাল বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলা উচিত। ছেলে-মেয়েরা যেন দেখে যে, বাপ-মার উপাসনার প্রতি একটা গভীর অনুরাগ আছে। তাহাদের সমক্ষে ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা করা বা ব্রাহ্মসমাজের শাখাবিশেষকে তুচ্ছ করা, উপহাস করা কখনও উচিত নয়। তাহারা যদি গুরুজনদের জীবনে পরচর্চ্চা, কলহ, সংযমহীনতা দেখে, তাহাতে বড় কুফল হয়।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, তাহাদের জন্য বাড়ীতে ভাল ভাল পুস্তক রাখা উচিত। মন্দ বই যাহাতে তাহারা না পড়ে সে জন্য বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। তাহাদিগকে গান-বাজনা রান্নাবান্না প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া উচিত, কিন্তু থিয়েটার ও অভিনয় করিতে দেওয়া ভাল নয়। বাড়ীতে একটী উপাসনার ঘর থাকা উচিত। বাপ-মা উপাসনা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না—তাহারা দেখুক। তাহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের কাজে লাগাইতে হইবে। বিশেষত, কেহ যদি ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে তাহাকে খুব উৎসাহ দেওয়া উচিত এবং তার উপযুক্ত কাজ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া উচিত। ক্রমে ক্রমে গুরুতর কার্য্যভারও তাহাকে দিতে হইবে।

(৪) ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন ও প্রচার। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত-রূপ কথাবার্ত্তা হইল :—

সাধন অর্থে ভগবানকে লইয়া থাকা। জীবনের সকল কার্য্যে ও চিন্তায় তাঁকে লইয়া থাকিতে হইবে। যখন পারিতেছি না বলিয়া মনে হইবে, তখনও তাঁকেই ডাকিতে হইবে। আত্মা পরমাত্মাতে তন্ময় হইয়া যাইবে। আমরা তাঁর প্রকৃতি লাভ করিয়া ফুটিয়া উঠিব। সময়ে সময়ে সংসার-কোলাহল হইতে দূরে গিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলে বিশেষ উপকার হয়। কিন্তু অনেকে উপাসনাকে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। যখন বিদ্যা বা ধন চাই তার জন্য আমরা সাধন করি, কিন্তু ব্রহ্মলাভের জন্য আমাদের সাধন নাই। আমাদের আত্মাকে আমরা বিলাসের ভোগে একেবারে ডুবাইয়া রাখিতেছি। আগে ব্রাহ্মেরা গরীব ছিলেন, কিন্তু তখন ব্রহ্মের জন্য কি পিপাসা ছিল! ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহীর ধর্ম্ম, সন্ন্যাস আমাদের লক্ষ্য নয়। কিন্তু যখন-যখনই অবসর পাই তখনও যদি ভগবানকে স্মরণ করি ও তাঁর চিন্তা করি তাহাতেও সুফল আছে, তাহাতেও অনেক সময়ে ভগবানের স্পর্শ লাভ করা যায়। যিনি সাধক তিনিই প্রচারক হইতে পারেন। প্রচারের গুরুত্ব যিনি অনুভব করেন না তিনি যেন প্রচার কার্য্যে অগ্রসর না হন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সংসারে থাকিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে—ব্রাহ্মধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব। মহর্ষিদেব বলিয়াছেন যে কি ধর্ম্মে, কি অর্থে, কি বিদ্যায় সকল বিষয়েই আমাদিগকে শ্রেষ্ঠস্থান গ্রহণ করিতে হইবে। নিজে যদি সাধনে অগ্রসর হওয়া যায়, তবেই সঙ্গের সকল লোককে লইয়া যাওয়া যায়। 'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ' এই মন্ত্র। অপরাধই করি আর ভালই করি তাঁকেই নিবেদন করিব। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

ষণ্ণবতিতম মাঘোৎসব।

প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারকার উৎসব গতানুগতিকতার গণ্ডিপথে বাঁধা পড়ে নাই; কিন্তু ভগবৎপ্রেরণা লাভে

বিচিত্র ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এবার তত্ত্ববোধিনীর পৌষ-সংখ্যায় আমরা মাঘোৎসবের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে জানাইয়াছিলাম যে, প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও মহর্ষিদেবের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণেই মাঘোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল। ব্রহ্মোপাসনার আদি প্রতিষ্ঠান, মাঘোৎসবের কেন্দ্রভূমি, নব্য বাঙ্গালার সূতিকা-গৃহ এই আদিব্রাহ্মসমাজ যে উৎসবের দিনটীতে নিতান্ত অজ্ঞাত অখ্যাত ও অবহেলিত-ভাবে ম্রিয়মাণ হইয়া একধারে পড়িয়া রহিবে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তাই উৎসবের অতি অল্পকাল পূর্ব্বেই ভগবান আমাদের অন্তরে যে নবপ্রেরণা দান করিলেন, তাহাতে আমাদের পূর্ব্ব সঙ্কল্প কোথায় ভাসিয়া গেল। নিতান্ত অসম্ভব ভাবিয়া যাহা এতদিন ব্যথিতচিত্তে দূরে পরিহার করিয়া আসিয়াছি, ভগবানের ইচ্ছায় ও অনুগ্রহে তাহাই আজ সহজ ও সুকর হইয়া উঠিল। আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরেই এবার উৎসবের আয়োজন ও অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

৬ই মাঘ বুধবার মহর্ষিদেবের তিরোধান-দিবস। এই দিন সন্ধ্যা ৬৷৷ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার "ব্রাহ্ম ভ্রাতা ও ভগিনীগণের প্রতি সবিনয় নিবেদন" পাঠ করিয়া উৎসবের উদ্বোধন করিলেন। তাঁহার শক্তিময়ী বাণী উপস্থিত জনগণের অন্তরে নবজাগরণের সূত্রপাত করিল। অতঃপর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মহর্ষিদেবের সাম্বৎসরিক' উপলক্ষে "মহর্ষির দান" বিষয়ে একটী উপদেশ পাঠ করিলেন। তাঁহার এই উপদেশের মধ্যে মহর্ষিদেব সম্বন্ধে একটী নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা স্থানান্তরে উহা প্রকাশ করিলাম।

গত বৎসর মাঘোৎসবে কথকতার সংযোজন করিয়া প্রাতঃকালের উপাসনায় নূতনত্বের বিধান করা হইয়াছিল। ইহা অনেকেরই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল বলিয়া এবারও তাহার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু প্রাতরুপাসনা অন্তে কথকতার আয়োজন করিলে সময়ের অনুরোধে সংক্ষিপ্ত করিতে হয় বলিয়া এবার ৯ই মাঘ শনিবার সন্ধ্যা ৬৷৷ ঘটিকায় 'রামমোহন-হলে' উহার আয়োজন করা হইল। কথক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় এবার "নারীমঙ্গল" বিষয়ে কথকতা করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা ইহার এই কথকতার স্থূল সারাংশ ও সংগীতগুলি স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম।

এবার ১০ই মাঘ রবিবার সায়ংকালে "ভবানীপুর সম্মিলন সমাজে" আদিসমাজের উৎসব পড়িয়াছিল। যথাসময়ে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদী গ্রহণ করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও স্বাধীনতা" বিষয়ে একটী উপদেশ পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা ইহা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। সঙ্গীতে যোগদান করিয়াছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকণ্ঠ শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল ও শ্রীমতী বাণী দেবী।

এবার ভগবৎপ্রেরণায় ১১ই মাঘের প্রাতঃকালীন উৎসব-আয়োজন আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরেই হইতেছিল, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিবিধ পত্র-পুষ্প-পল্লবে ও ওঁকারাঙ্কিত গৈরিক পতাকায় বহুদিন পরে রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিমণ্ডিত এই সুপ্রাচীন উপাসনালয় আজ উৎসবোচিত সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া যেন মৃদু মধুর হাস্য করিতেছিল। ১১ই মাঘের পুণ্যপূত প্রভাত-আলো ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই নহবতের শানাই বাজিয়া উঠিল। সুরে সুরে প্রভাতের আকাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়া মন্থর হইয়া উঠিল, হৃদয়ের মাঝে থাকিয়া থাকিয়া আনন্দের অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে আনন্দময় উৎসবদেবতার বরণ হইতে লাগিল। অবশেষে প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় যখন শঙ্খ-ঘণ্টার নিনাদে ও ধূপ-ধুনার সৌরভে সমগ্র উপাসনাগৃহটী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন সমবেতকণ্ঠে বেদগান উত্থিত হইল—"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু"। অতঃপর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করিলেন। প্রথমে আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য প্রখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীমান সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় একটী সঙ্গীত করিবার পর উদীয়মান গীতিকবি সৌম্যদর্শন শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল তাঁহার স্বভাবসুমিষ্ট কণ্ঠে একটী গান গাহিলেন। তখন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রবাবু তাঁহার পরলোকগত পিতৃব্য পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিমণ্ডিত যে অগ্নিময়ী উদ্বোধনী বাণী শুনাইলেন, তাহার তুলনা নাই। অতঃপর যথারীতি পুনরায় দুইটী সঙ্গীত হইবার পর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় তাঁহার স্বভাবসুগম্ভীর কণ্ঠে স্বাধ্যায় পাঠ করিলেন। স্বাধ্যায়ান্তে শ্রীমতী বাণী দেবী নানা তানলয় সহকারে যে সঙ্গীতটী গাহিলেন তাহা স্বরমাধুর্য্যে সকলের হৃদয় স্পর্শ করিল। অতঃপর ক্ষিতীন্দ্রবাবু ওজস্বিনী ভাষায় "অগ্রসর হও" বিষয়ে যে উপদেশ দান করিলেন, তাহা যেমন-তেজঃপূর্ণ, তেমনই বড়ই সময়োপযোগী হইল। সভাস্থ সকলে একান্ত মুগ্ধচিত্তে উৎকর্ণ হইয়া উহা আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিলেন। আমরা ক্ষিতীন্দ্রবাবুর এই উদ্বোধন ও উপদেশ আগামী ফাল্গুন-সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশ করিব।

সায়ংকালের উৎসব এবার যথারীতি মহর্ষিদেবের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথের সদ্য বিয়োগ-বিধুরা সভা এবার বিবিধ পত্র-পুষ্প-পল্লবে শোভাময়ী না হইয়া বৈধব্যের রিক্ততায় মহিমময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। বোলপুর শান্তিনিকেতনের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এম-এ মহাশয় এবার একাকী বেদী গ্রহণ করিয়া যথারীতি উদ্বোধন, স্বাধ্যায় ও উপদেশ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্বোধন ও উপদেশ প্রধানতঃ সাধক কবি কবীরের প্রখ্যাত 'দোঁহা' অবলম্বনে বিরচিত হইয়াছিল। এই ভক্তবাণী অবলম্বনে ক্ষিতিমোহন বাবু প্রেম-ধর্ম্মের যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত উপাসকবর্গ একান্ত বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সায়ংকালের সঙ্গীতগুলি প্রধানতঃ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীমতী মনীষা দেবী, শ্রীমতী শোভনা দেবী এবং শ্রীমান সৌম্যেন্দ্রনাথের পরিচালনায় নির্ব্বাহ হইয়াছিল। শ্রীমতী রমা দেবী ও শ্রীমতী দীপ্তি দেবীর গীত সঙ্গীত-দুইটী সকলের খুব মিষ্ট লাগিয়াছিল। তদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিও এক-একটী সঙ্গীত করিয়াছিলেন।

১৩ই মাঘ বুধবার উৎসবের উপসংহার। এই দিন সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় আদি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদী গ্রহণ করেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবু এই বলিয়া সভার উদ্বোধন করেন যে, সে দিন "অগ্রসর হও" বক্তৃতায় তিনি যে মিলনের গান গাহিয়াছিলেন, তাহারই আংশিক সফলতার উদ্দেশে আজিকার এই অনুষ্ঠান। অতঃপর কৃষ্ণকুমার বাবু আদিব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন কাহিনী ও গৌরবের ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত জনগণকে উদ্বোধিত করেন। পরে যথারীতি সঙ্গীত ও স্বাধ্যায় সমাপ্ত হইলে কৃষ্ণকুমার বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম তদ্বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ সুন্দর উপদেশ দেন।

এবারকার উৎসব-আয়োজনে আমরা কয়েক জন বন্ধুর অযাচিত সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে ধন্য হইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার বার-এট-ল ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়ালের নাম উল্লেখযোগ্য।

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদ্যশ্রাদ্ধ।

বিগত ১৪ই মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতে নবম ঘটিকায় মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় সুযোগ্য পুত্রগণ কর্তৃক মহর্ষিদেব-প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-ভবনে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিবস যথাসময়ে বিবিধ সাজসজ্জায় ও দানসামগ্রীতে এবং গণ্যমান্য বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের সমাগমে শ্রাদ্ধসভাটী শোভনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুই প্রস্থ দানসামগ্রী উৎসর্গ করেন। শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সরলা দেবী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও শ্রীমতী রমা দেবী কয়েকটী সঙ্গীত করিয়া সভাস্থলের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্যকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের জলযোগের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

গত ১৬ই মাঘ শনিবার দ্বিপ্রহরে 'নিয়মভঙ্গ' উপলক্ষে একটী বিশিষ্ট ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। ইহাতে প্রায় ৩০০ শত লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতনে আদ্যশ্রাদ্ধ।

বোলপুর—শান্তিনিকেতনই পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথের শেষ জীবনের যথার্থই 'শান্তিনিকেতন' হইয়াছিল। এই স্থানটী তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। ইহার আকাশ-বাতাস, ফল-ফুল, পক্ষী-পতঙ্গের সঙ্গে তিনি প্রীতির ঘনিষ্ঠ যোগে নূতন সংসার পাতিয়া বসিয়াছিলেন। এই আশ্রমের সর্ব্বত্র তাঁহার পুণ্যস্মৃতির এক অচ্ছেদ্য যোগ অনুভব করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিশ্বভারতীর খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে উক্ত দিবস যথাসময়ে 'শান্তিনিকেতন আশ্রমে' তাঁহার পূজনীয় অগ্রজের যথাশাস্ত্র বৃষাদি উৎসর্গ পূর্ব্বক এক স্বতন্ত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন এবং তদীয় পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে একটী কূপখননের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে গত ২০শে মাঘ বুধবার সেখানে একটী বৃহৎ ভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত দিবস সমাগত দরিদ্রদিগকে ভোজনান্তে এক-একখানি কম্বল উপহার দেওয়া হইয়াছে।

দুইটী পত্র।

কুমিল্লা—৮ই মাঘ।

শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজনেষু—

গত পরশু স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিদেবের স্মৃতিসভায় তাঁহার উদ্দেশে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ও

প্রীতির অঞ্জলি অর্পণ কালে বলিয়াছিলাম,—"লৌকিক গণনায় মহর্ষিদেব তাঁহার স্বীয় ধামে প্রত্যাগমন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা অদ্যাপি তাঁহার পার্থিব মূর্ত্তির মধ্যেই তিনি বিরাজিত রহিয়াছেন দেখিতেছি। জানি না কোন্ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি পুত্রের "আত্মজ" নামকরণ করিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনে এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাঁহারা দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছেন ও দ্বিজেন্দ্রনাথকে জানেন, কেবল তাঁহারাই এই উক্তির সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ মহর্ষিপদবাচ্য তাঁহার পিতার সর্ব্বপ্রকার গুণের অধিকারী হইয়া এবং তাঁহারই ন্যায় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া পিতার প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম্মের দিব্য আলোক হস্তে ধারণ করিয়া আমাদের জন্য সত্যের পথ, কর্ত্তব্যের পথ ও আত্মার সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন; তাঁহার মধ্যে আমরা মহর্ষিকেই দেখিতেছি, ধন্য আমাদের জননী জন্মভূমি—কে বলে তুমি কাঙ্গাল? যে দেশে দেবেন্দ্রনাথ জন্মান ও তাঁহার হস্ত হইতে সত্যের পতাকা গ্রহণ করিবার জন্য "আত্মজ" দ্বিজেন্দ্রনাথ পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকেন, সে দেশ জগতে বরেণ্য। যদি জেরুজিলাম নিজেকে পুণ্যক্ষেত্র বলিবার দাবী রাখে, তবে আমাদের কলিকাতারও সে দাবী ও মর্য্যাদা কোন অংশে কম নহে।"

তখন জানিতাম না যে দ্বিজেন্দ্রনাথও অমরধামের যাত্রী হইয়াছেন! এই সংবাদে প্রাণে বড়ই ধাক্কা লাগিয়াছে। বড় জ্যেঠামহাশয়ও চলিয়া গেলেন; জ্ঞানের গভীরতায়, হৃদয়ের বিশালতায় ও চরিত্রের সমুন্নততাতে যিনি সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রধান আলোকস্তম্ভ ছিলেন, তাঁহাকে হারাইয়া দেশ যে কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিককে হারাইয়াছে, তাহা নহে—দেশের আলোক-রবিই অস্তমিত হইয়াছেন। এই বরেণ্য পরিবারেই আবার এই রবির পুনরাবির্ভাব হইবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই রাখি না—আপাততঃ শোকে হৃদয় মুহ্যমান হইলেও দুঃখ করি না—এই বিষাদের দিনেও "রসোবৈ সঃ" "তিনি রসস্বরূপ তৃপ্তির হেতু"—তাঁহারই প্রসন্নমুখ এই ঘটনাতেও দর্শন করি ও কৃতজ্ঞতাবনতমস্তকে তাঁহাকে বারম্বার প্রণিপাত করি।

স্নেহানুগত
শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

***

"ব্রুকসাইড"
গিরিধি,
২৫।১।১৯২৬

অভিন্নহৃদয়েষু—

আপনার জ্যেঠামহাশয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হইলাম। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমন সাধুপুরুষের মৃত্যুই দেশের পক্ষে একটা শোকের ব্যাপার। বিশেষ, ব্রাহ্মধর্ম্মের ছায়াতে যে সকল লোক দেবজীবন লাভ করিয়া আমাদের নিকটে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রবাবু তাঁহাদেরই মধ্যে অন্যতম। আজ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে হারাইয়া কত দরিদ্র! পৃথিবীতে তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার আর পূর্ণ হইল না।

আপনাদেরই
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

প্রভাতী।—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত। রয়াল ১৬ পেজী; ১২৬+৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৮০ আনা মাত্র।

এখানি একখানা ধর্ম্মোপদেশমূলক গদ্যে পদ্যে লিখিত গীতিকাব্য। গ্রন্থকারের হৃদয়ে ধর্ম্মজগতের ও কর্ম্মজগতের যে সব চিন্তার ধারা উদিত হইয়াছিল, তাহাকে ভাষা দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি, গ্রন্থকারের প্রভাতের বিমল চিন্তাধারা সরস, প্রাঞ্জল ভাষার ভিতর দিয়া শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, পড়িতে পড়িতে মনে এক অনির্ব্বচনীয় দিব্য ভাবের উদয় হয়। যাঁহারা সৎচিন্তা ধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া মহৎ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে চাহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িক ভাবের বিভীষিকা নাই। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই মনোরম।

সৌরভ, কার্ত্তিক ১৩৩২।

আলোচ্য পুস্তকখানি গদ্য-পদ্যের গীতি-কাব্য। ভক্তের হৃদয়ে বিমল শুভ্র প্রভাতে যে সকল চিন্তা স্বতঃ জাগ্রত হয়—যে সকল উচ্চভাব আসিয়া হৃদয়াকাশে ফুটিয়া উঠে, গ্রন্থকার নিজ জীবনের মধ্য দিয়া সেই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন কষ্ট-কল্পনা নাই—লোক মনোরঞ্জনকর বিনান বাক্যচ্ছটা নাই; ইহা revealation রের মত পবিত্র, উপভোগ্য ও একটা অপার্থিব জ্যোতিঃমণ্ডিত। আমাদের বড় ভালো লাগিয়াছে।

স্বাস্থ্য-সমাচার, আষাঢ় ১৩৩২।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি—পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শেষ বাণী। দ্বিতীয় সংস্করণ। রয়াল ১৬পেজী আকারে ১১৫+২২+১০পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৫ আনা।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র; জীবনকালে মহর্ষি স্বীয় পৌত্রের নিকট 'ব্রাহ্ম ধর্ম্মের' মূলনীতি—বিশ্বজনীন জ্ঞান, ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি—কেমন করিয়া ভগবদেচ্ছায় সাধিত হইয়া চলিয়াছে, তাহাই তৎকালীন বালক পৌত্রের নিকট কথাচ্ছলে পরিব্যক্ত করিতেন; ক্ষিতীন্দ্রনাথ সেগুলি একান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সেই বক্তৃতাগুলি বর্ত্তমান নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রায় ৩১ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন; এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। পুস্তকখানির সমালোচনা কি করিব—পুস্তকখানি পড়িলে মনে হয় যেন মহর্ষি পুনরায় বাঙ্ময় হইয়া সম্মুখে বসিয়া উপদেশ দিতেছেন। জ্ঞান ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রত্যেকটি বিষয় এমন নিখুঁত সুশৃঙ্খল সৌন্দর্য্যের সহিত লিপিবদ্ধ করা সঙ্কলয়িতার অসীম লিপিচাতুর্য্য ও শ্রুতিধৃতির পরিচায়ক। পুস্তকখানি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার পুনঃ পুনঃ পাঠ করা উচিত।

স্বাস্থ্য-সমাচার,
আষাঢ়—১৩৩২।

গার্হস্থ্য-সংবাদ।

আদ্যশ্রাদ্ধ—বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ রবিবার প্রাতঃকাল ৮॥০ ঘটিকার সময় ৺ তারিণীচরণ গুপ্ত মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় সুযোগ্য পুত্রগণ কর্ত্তৃক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসবাটীতে সুসম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। উক্ত দিবস যথাসময়ে পুষ্পমাল্য-গন্ধ-ধূপাদির পবিত্র সৌরভে শ্রাদ্ধসভাটী পূর্ণ হইলে সর্ব্বাগ্রে একপ্রস্থ দানসামগ্রী উৎসর্গীকৃত হইল। অতঃপর আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় পরলোকগত গুপ্ত মহাশয়ের পরমাত্মীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক প্রাচীন ব্রাহ্মভক্ত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত মহাশয়ের সহিত বেদীগ্রহণ করেন। প্রথমে আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত একটী উদ্বোধন পঠিত হইলে যথারীতি শ্রাদ্ধকার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত মহাশয় বেদী হইতে লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশে যে ক্ষুদ্র "স্নেহনিবেদন"টুকু এবং "কয়েকটী কথা" পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা এতই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, সভাস্থ কেহই উদ্বেল নয়নাশ্রুকে রুদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। আত্মীয়-আত্মীয়াগণ সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সমবেত কণ্ঠে কয়েকটী হৃদয়স্পর্শী সঙ্গীত করিয়া সভাস্থলের পবিত্রতা বৰ্দ্ধিত করিয়াছিলেন। হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের বহু নরনারীর সমাগমে শ্রাদ্ধসভাটী একটী পবিত্র সম্মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। উক্ত দিবস রাত্রিতে একটী বিশিষ্ট ভোজের আয়োজন হইয়াছিল।

সংবাদ।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। বঙ্গ-মহিলা শিক্ষালাভ করিলে যে কতদূর উচ্চে উঠিতে পারেন, শ্রীমতী নাইডু তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বদেশ-প্রেম তাঁহার অস্থি-মজ্জা-গত। দেশের কল্যাণ কামনায় তিনি আপনার জীবন ও অদ্ভুত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। তাই তিনি দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া আপনার বাগ্মীতা গুণে ও অতুলন ভাষার ঝঙ্কারে চারিদিকে চেতনার বীজ উপ্ত করিতেছেন। এবার দেশ-মাতৃকা যজ্ঞে শক্তি বিলাইবার জন্য দেবী সরোজিনীর আবাহন হইয়াছিল। তিনি এই বর্ষে কংগ্রেসে নেত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সফলতা-মণ্ডিত কর্ম্মময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শোক-সংবাদ।

৺অবিনাশচন্দ্র মজুমদার। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার বিগত ৫ই পৌষ রবিবার লাহোরে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি সরকারি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহার পরিণত জীবন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। পঞ্জাব তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। তিনি বাবা নানকের পদাবলী 'তত্ত্বকৌমুদীতে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিতেছিলেন। আমরা তাহা পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতাম। তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য তদীয় কন্যা শ্রীমতী হেমপ্রভা লাহোরে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

মহারাজা ৺জগদিন্দ্রনাথ রায়। নাটোরের বড়তরফের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ বিগত ২১শে পৌষ মঙ্গলবারে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। ইনি প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর বংশধর ছিলেন। জগদিন্দ্রনাথের মত সর্ব্বগুণালঙ্কৃত জমিদার অভিজাতসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় দৃষ্টিগোচর হইত না। বিনয়ে বিদ্যায় সাহিত্যে ও সঙ্গীত-চর্চ্চায় তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। কি রাজনৈতিক ব্যাপারে কি অন্যবিধ সভা-সমিতিতে তিনি এদেশের একজন অগ্রণী ছিলেন। "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকা তিনি সম্পাদন করিতেন, এবং আপনার লিপিচাতুর্য্যে কি কবিতায় কি প্রবন্ধে তিনি স্বীয় নাম রাখিয়া গেলেন। অমায়িকতা ও নিষ্ঠা গুণে জন-সাধারণের সহিত মিলিতভাবে কার্য্য করিবার তাঁহার যথেষ্ট শক্তি ও ইচ্ছা ছিল। ব্যায়ামচর্চ্চার প্রতিও তিনি উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গদেশ একটি উজ্জ্বল রত্ন হারাইল। তাঁহার অমর আত্মা ভগবানের সুশীতল ক্রোড়ে স্থান লাভ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

৮০

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মাসিক

আগামী বৈশাখে **৮৪ বৎসরে** পদার্পণ করিবে

তাহার নব-আয়োজনে

আমাদের সানুনয় নিবেদন।

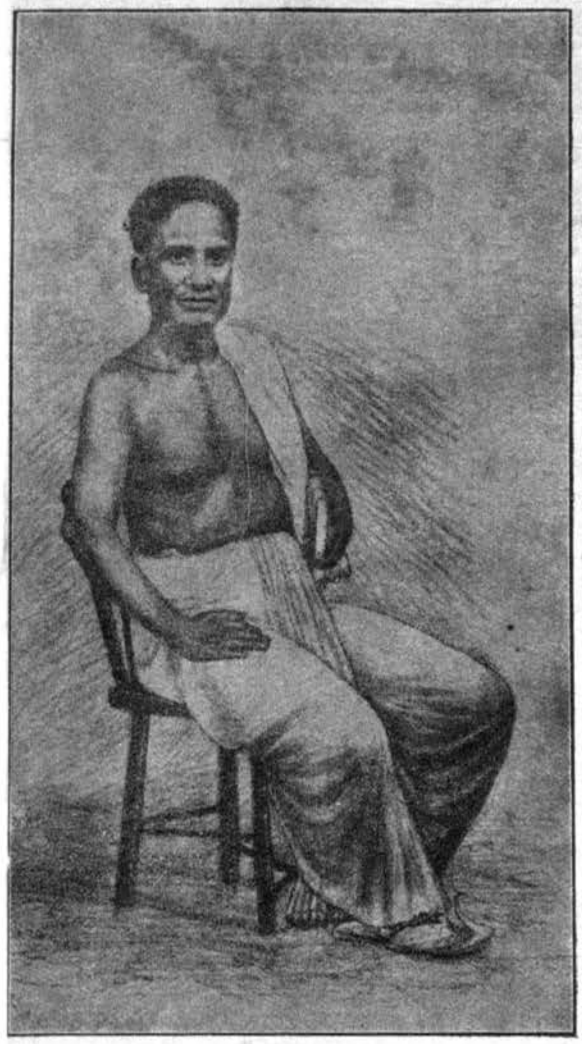
১। এবৎসর আমাদের গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেকে সানন্দে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাদিগকে পরম উৎসাহিত করিয়াছেন ; এজন্য সর্ব্বাগ্রে আমাদের প্রিয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

২। আমাদের পরম আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই পত্রিকার গ্রাহক মাত্রেই ধর্ম্মপ্রাণ ও সুরুচিসম্পন্ন। তাঁহাদের উৎসাহে ও আনুকূল্যে আমরা ইহাকে ধর্ম্ম ও দর্শন ব্যতীতও ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ প্রবন্ধে সজ্জিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিশেষতঃ তাঁহাদেরই তৃপ্তিবিধানার্থ গত বৎসর হইতে সানুবাদ সঙ্গীতশাস্ত্র, সঙ্গীতবিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ ও সুভাব সঙ্গীতের স্বরলিপি এবং রুচিসঙ্গত যথোচিত চিত্র প্রকাশেও আমরা শ্রম ও অর্থব্যয়ে কিছুমাত্র কার্পণ্য প্রদর্শন করি নাই। আগামী বর্ষে ইহার অধিকতর উন্নতি বিধানের ইচ্ছা আছে ; এবিষয়ে আমরা গ্রাহকগণের নিকট হইতে উৎসাহ ও উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করি। অধিকন্তু তাঁহাদের নিকট আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন প্রত্যেকেই আগামী বর্ষের জন্য অন্তত একটী করিয়াও নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া এই পত্রিকার অধিকতর উন্নতি সাধনে আমাদের সহায়তা করেন। আশা করি রাজা রামমোহন রায়ের সাধনা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কীর্ত্তি এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞানের ধারাকে প্রবহমান রাখিবার এই পুণ্য কর্ম্মে আমরা তাঁহাদের সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হইব না।

৩। আমাদের পুরাতন গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা আজও পত্রিকার প্রাপ্য মূল্য প্রেরণ করেন নাই বা পত্রিকা প্রেরণের নিষেধাজ্ঞাও জ্ঞাপন করেন নাই,—বিশেষতঃ আমাদের গত আশ্বিন-সংখ্যার আবেদনও যাঁহাদের নিকট ব্যর্থ হইয়াছে, তাঁহাদের কাছে আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে তাঁহাদের দেয় মূল্য নিম্নের ঠিকানায় মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া দেন। ভি পি করিয়া গ্রাহকগণকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করা আমরা ভালবাসি না। এবারেও যাঁহাদের নিকট হইতে আমরা কোনও সাড়া পাইব না, তাঁহাদের পত্রিকাগ্রহণে অনিচ্ছা আছে বুঝিয়া আমরা আগামী বৈশাখ হইতে তাঁহাদের নিকট পত্রিকা প্রেরণ বন্ধ করিতে বাধ্য হইব। আশা করি, ধর্ম্মপ্রাণ গ্রাহকদিগের সম্বন্ধে আমাদের এতদূর অগ্রসর হইবার কোনও কারণ ঘটিবে না। ইতি—

আদিব্রাহ্মসমাজ,
৫৫নং আপার চিৎপুর রোড,
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

বিনীত
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।



পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন



প্রৌঢ়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ



৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী



৺শরৎকুমারী চৌধুরাণী

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

ফাল্গুন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৬।

৯৯১ সংখ্যা ১৮৪৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিগতাব্দ ৫০২৬। সম্বৎ ১৯৮২। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৭। সাল ১৩৩২।

অগ্রসর হও। *

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের যে বাণী আমার অন্তরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি, সেই বাণী আজ আমি সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। জগতের সকল ঘটনারই ভিতর দিয়া বর্ত্তমান যুগে সেই বাণী যেন প্রবল শক্তিতে ফুটিতে চাহিতেছে। শতদলের প্রত্যেক অণুপরমাণু যখন শতদলের ভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই যেমন সেই সমস্ত অণুপরমাণু মিলিত হইয়াই শতদলের আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, সেইরূপ ভগবানের যে বাণী আজ এই ভক্তজনের সভায় উপস্থিত করিতে আসিয়াছি, সেই বাণী একা আমারই অন্তরে নহে, আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; এবং সেই কারণেই তাহা অন্যান্য শত শত ব্যক্তির ন্যায় আমারও মুখ হইতে ব্যক্ত আকার লাভ করিতে চাহিতেছে। অন্তরে কান পাতিয়া উপলব্ধি কর, যে বাণী আমাদের সকলের হৃদয় ভেদ করিয়া মুক্ত গগনের অভিমুখে সমুত্থিত হইতেছে, সেই বাণী হইতেছে—অগ্রসর হও—অগ্রসর হও।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডের যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই আজ সমুত্থানের লক্ষণসকল নয়নগোচর হইবে। বিশেষত প্রাচ্য জগতের, কেবল ভারতবর্ষ নহে, কিন্তু চীন, তাতার, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি যে দিকে কর্ণপাত করিবে, সেই দিকেই শুনিতে পাইবে—ঐ অগ্রসর হইবার একই বাণী মহাসাগরের সুমহান গম্ভীর নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের আত্মগর্বিত ও বলদৃপ্ত জাতিসকল কিছুকাল পূর্ব্বে যে আফ্রিকার অধিবাসীগণকে, অন্তরে সত্যসত্য ধর্ম্মহীন অসভ্য ও পশুতুল্য বলিয়া বিবেচনা করিত কি না জানি না, কিন্তু জগতের সম্মুখে ঐ সকল অনুচিত ও অন্যায় বিশেষণে বিশেষিত করিতে ভাল বাসিত, আজ সেই আফ্রিকার অধিবাসীগণেরও প্রতি চক্ষু খুলিয়া দেখ, দেখিবে—তাহাদেরও মধ্যে অগ্রসর হইবার মহাবাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদেরও প্রাণে এক নবজাগরণ সাড়া দিয়া উঠিয়াছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সমগ্র জগতে এক মহা নবজাগরণের যুগ নামিয়া আসিয়াছে।

ধীরভাবে আলোচনা করিলে দেখিবে যে, এই নবজাগরণের সূত্রপাত হয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন হইতে। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের আকারে যে জাগরণের বীজ এই ভারতভূমিতে রোপণ করিয়াছিলেন, কে অস্বীকার করিবে যে, আজ সেই বীজ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়া সমগ্র জগতকে আশ্রয় দিতে চলিয়াছে? রামমোহন রায় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার যে

* ৯৬তম মাঘোৎসব উপলক্ষে পঠিত।

এক আশ্চর্য্য ভাবতরঙ্গ চালাইয়া দিয়াছিলেন, আজ সেই তরঙ্গের জগদ্ব্যাপী প্রসার দেখিয়া কাহার হৃদয় না আনন্দিত হয়? ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবের কারণেই ভারতবাসী নিজের হারানিধি মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া পাইয়াছে, এবং সেই মনুষ্যত্বের উপর দাঁড়াইয়াই ভারতবাসী আজ জগতের মহাসভায় নিজের আসন সুদৃঢ় করিবার জন্য ন্যায্য দাবী করিতে সক্ষম হইতেছে। এই মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া পাইবার ফলেই আজ বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু বিজ্ঞানবিষয়ক নবতর সত্য আবিষ্কারে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। এই মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া পাইবার ফলেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র হইতে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার শিষ্যগণ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মুক্তির নবতর বার্ত্তা ঘোষণা করিতে সাহস করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের আবিষ্কৃত মনুষ্যত্বের স্বাধীনতাবায়ুতে পরিপুষ্ট বলিয়াই পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতাঞ্জলির চরণে সমগ্র ভূখণ্ডের মস্তক অবনমিত করিতে পারিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় সেই যে জাগরণের নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, আজ শতাব্দীর পরে সেই নবযুগের সন্ধিক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে; এখন সন্ধিক্ষণের অরুণ আভার পরিবর্ত্তে নবজাগরণের নবোজ্জ্বল সূর্য্য আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে। ক্ষণজন্মা রামমোহন রায় সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির যে ক্ষীণধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, আজ তাহাতে জোয়ার আসিয়াছে। কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই জোয়ার প্রতিরুদ্ধ করে।

এই নবজাগরণের দিনে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না। শুভ ভাব ও চিন্তার দ্বারা, শুভ কর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের দ্বারা নবজাগরণের সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত এই জগতের মধ্যে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত কর; নিজের জীবনতরীতে পাল তুলিয়া দাও এবং জোয়ারের সাহায্যে উন্নতি ও স্বাধীনতার পথে খরবেগে চলিয়া যাও। আত্মদৃষ্টির সমুজ্জ্বল প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া অমৃতধামের পথে অগ্রসর হও। আমাদের প্রত্যেকেরই ইহা উপলব্ধির বিষয় যে, আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরে অমৃতধামের যাত্রী হইবার, মৃত্যুর অতীত হইবার একটা স্বাভাবিক প্রবল ইচ্ছা সর্ব্বদাই জাগ্রত আছে। যদি মৃত্যুর অতীত হইতে চাও, তবে অগ্রসর হও। জাগরণের যে প্রবল জোয়ার আসিয়াছে, তাহার সম্মুখে নিদ্রা ও আলস্যের প্রশ্রয় দিলে মৃত্যু ও বিনাশ অপরিহার্য্য।

সংসারের এই রণক্ষেত্রে শ্রেয় ও প্রেয়ের, উন্নতি ও অবনতির, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কঠোর সংগ্রাম চলিয়াছে। এই রণক্ষেত্রে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে চাহিবে কে? পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেই তো মৃত্যু। এই দারুণ সংগ্রামে অগ্রসর হইলেই জীবনলাভ। জীবনলাভ করিতে যদি চাও, তবে অগ্রসর হও—প্রাণের মধ্যে এই মন্ত্রই আঁকড়াইয়া ধর; প্রাণের মধ্যে এই মন্ত্রই জাগাইয়া রাখ। অন্তরে এই প্রশ্ন স্পষ্টভাবে কর—নানা অবান্তর বিষয় আনিয়া প্রশ্নটীকে চাপা দিও না—বাঁচিতে চাও, অথবা মরিতে চাও? নিজ নিজ অন্তরে এই প্রশ্নের সমাধান চাও যে, মরণের অগ্নিতে পুড়িয়াও জীবনলাভ করিতে চাও, অথবা জীবনীশক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া জড়তা ও আলস্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে যক্ষ্মারোগীর মত নিজের অজানতই মৃত্যুপথের পথিক হইতে চাও? ইহা নিঃসন্দেহ যে, জিজ্ঞাসুমাত্রেই প্রাণের ভিতর হইতে এই উত্তরই পাইবেন যে, জীবনের নামে নামেমাত্র বাঁচিয়া থাকিয়া প্রকৃতপক্ষে মরণের পথে চলা অপেক্ষা মরণের অগ্নিতে শতবার পুড়িয়া অন্ততঃ একটীবারও প্রকৃত জীবনের আস্বাদ লাভ করা শ্রেয়স্কর।

মরণের পথ অতিক্রম করিয়া নবজাগরণের পথে চলিতে চাহিলে, আত্মদৃষ্টির প্রদীপ জ্বালাইয়া অমৃতধামের যাত্রী হইতে গেলে, বৃথা খেলায় মত্ত থাকিলে চলিবে না—দুর্ব্বলের ন্যায় সময়কে অবহেলায় বহিয়া যাইতে দিলে চলিবে না; মরণের মোহঘোরে আপনাকে হারাইয়া দিলে চলিবে না। কর্ত্তব্যের চরণে, ধর্ম্মের চরণে পলে পলে তিলে তিলে আপনাকে বলিদান করিতে হইবে। প্রতি মুহূর্ত্তে নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিজের প্রকৃত মঙ্গল, সমাজের প্রকৃত মঙ্গল, দেশের প্রকৃত মঙ্গল খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, এবং সেই সকল মঙ্গলের অনুষ্ঠানেই আপনাকে নিরত রাখিতে

হইবে, জগতের বিরাট ও মহান স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ মিলাইয়া লইতে হইবে। ধর্ম্ম তাঁহার বাম হস্তে তোমার সম্মুখে ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের উপায় প্রেয়কে ধারণ করিতেছেন; ধর্ম্ম তাঁহার দক্ষিণ হস্তে তোমার সম্মুখে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল ও স্বাধীনতার উৎস তাঁহার বরাভয়প্রদ শ্রেয়কে ধারণ করিতেছেন। নিজের অন্তরে জিজ্ঞাসা কর— কোন্‌টাকে প্রাণের ভিতর বরণ করিয়া লইবে? প্রেয়কে গ্রহণ কর—মৃত্যু তোমার হস্তগত— তাহার মধ্যে প্রকৃত জীবন পাইবে না; নিশ্চয় জানিও যে, ক্ষুদ্র স্বার্থের চরণে চিরদাসত্বের খতে তুমি স্বাক্ষর করিলে, এবং সেই দাসত্বের অপরিহার্য্য সঙ্গী অপমানের বোঝা তোমাকে মাথায় লইয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে।

প্রেয়কে বরণ করা, আর মরণের সঙ্গে খেলা করা একই কথা। মরণের সঙ্গে খেলা কর,— মরণ তাহার স্বভাবধর্ম্মে তোমার সমস্ত বল চুষিয়া পান করিবে, তোমার সমস্ত তেজ নিঃশেষে হরণ করিবে। কিন্তু এই সংসারে বলহীন ও মৃত্যুপথের পথিকের স্থান নাই। বলহীন মরণোন্মুখ ব্যক্তির প্রতি সংসারের লোক দুই চারিবার করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে, কিন্তু মানুষের উপযুক্ত স্থান অধিকার করিবার পথে, তাহার ন্যায্য অধিকার লাভের পথে তাহাকে সহায়তা করিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইবে না। প্রেয়কে বরণ করিবার ফলে দাসত্বের খতে স্বাক্ষর করিবার ফলে যে অপমানভার মাথায় লইয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার জন্য চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইলেও কেহই সেদিকে দৃক্‌পাতও করিবে না। ইহা চিরন্তন সত্য যে, সিংহও পীড়িত হইলে সকলের অবজ্ঞার পাত্র হইয়া পড়ে।

সংসারে যদি সত্যই বাঁচিতে চাও, জগতের মহাসভায় যদি মানুষের উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে চাও, দাসত্বকে যদি পদদলিত করিতে চাও, অপমানের বোঝা যদি মাথা হইতে নামাইয়া ফেলিতে চাও, তবে শ্রেয়কে বরণ করিতেই হইবে; প্রতি পদে মরিয়া-মরিয়াও নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার বল অর্জ্জন করিতে হইবে; মৃত্যুকে জয় করিতে হইবে; প্রতি পদে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে জগতের বিরাট স্বার্থের চরণে বলিদান করিয়া জগতের মঙ্গলসাধনে আপনাকে নিরত রাখিতে হইবে। এই ভাবে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতালাভের পথে তোমার নিজেকেও চালাইতে হইবে, এবং সেই সঙ্গে মানবমণ্ডলীকেও শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করিতে হইবে। ইহার ফলে তুমিই অবাক হইয়া দেখিবে যে, তোমারও মঙ্গলসাধনে, তোমারও বলবিধানে সমস্ত জগত অগ্রসর হইবে—পরস্পরের সাহচর্য্যে অগ্রসর হওয়াই ভগবানের মঙ্গল বিধান।

নিস্তরঙ্গ পুষ্করিণীতে যেমন সূর্য্যের সুবিমল প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ শ্রেয়ের ভিতরেই ধর্ম্মের বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব সম্যক উপলব্ধ হয়। শ্রেয়ের ভিতরেই ধর্ম্মের মূল কথা উপলব্ধি করি— তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব— ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ধর্ম্মের কেন্দ্র হইলেন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরব্রহ্ম। তাই শ্রেয়কে অবলম্বন করিলেই আমরা ভগবানকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বিশ্বপিতা অখিলমাতা বলিয়া উপলব্ধি করি।

বর্ত্তমান যুগে সমগ্র জগতে শ্রেয় ও প্রেয়ের কঠোর দ্বন্দ্ব চলিয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের যেন মনে হয়, প্রাচ্য ভূখণ্ডে, বিশেষত ভারতভূমিতেই এই সংগ্রাম ধীরে ধীরে অধিক হইতে অধিকতর প্রগাঢ়তা লাভ করিতেছে। আজ দেখি, ভারতবাসীকে শ্রেয় ও প্রেয় দুই বিপরীত দিকে প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করিতেছে। শ্রেয় টানিতেছে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে, স্বাধীনতার দিকে, জীবনের পথে; প্রেয় টানিতেছে অবনতির দিকে, দাসত্বের দিকে, মরণের পথে। কিন্তু শ্রেয়ের ভিতরেই ধর্ম্মের সুবিমল ছায়া প্রকাশ পায় এবং সেই ধর্ম্মের মূল কেন্দ্র হইল ভগবানের উপাসনা—ব্রহ্মনাম। রাজা রামমোহন জানিতেন যে, একমাত্র পরব্রহ্মই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, তিনিই একমাত্র স্বাধীনপুরুষ; তিনি জানিতেন, সেই পূর্ণস্বাধীন ভগবানের ছায়া যে জাতিকে যে ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে, সেই ব্যক্তির সেই জাতিরই ভিতরে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার একটা বিরাট জাগরণ ফুটিয়া উঠিবে; তাঁহার নামের ভিত্তির উপরে গ্রথিত ধর্ম্মের বিজয়বার্ত্তা যেখানে

এক আশ্চর্য্য ভাবতরঙ্গ চালাইয়া দিয়াছিলেন, আজ সেই তরঙ্গের জগদ্ব্যাপী প্রসার দেখিয়া কাহার হৃদয় না আনন্দিত হয়? ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবের কারণেই ভারতবাসী নিজের হারানিধি মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া পাইয়াছে, এবং সেই মনুষ্যত্বের উপর দাঁড়াইয়াই ভারতবাসী আজ জগতের মহাসভায় নিজের আসন সুদৃঢ় করিবার জন্য ন্যায্য দাবী করিতে সক্ষম হইতেছে। এই মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া পাইবার ফলেই আজ বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু বিজ্ঞানবিষয়ক নবতর সত্য আবিষ্কারে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। এই মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া পাইবার ফলেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র হইতে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার শিষ্যগণ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মুক্তির নবতর বার্ত্তা ঘোষণা করিতে সাহস করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের আবিষ্কৃত মনুষ্যত্বের স্বাধীনতাবায়ুতে পরিপুষ্ট বলিয়াই পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতাঞ্জলির চরণে সমগ্র ভূখণ্ডের মস্তক অবনমিত করিতে পারিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় সেই যে জাগরণের নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, আজ শতাব্দীর পরে সেই নবযুগের সন্ধিক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে; এখন সন্ধিক্ষণের অরুণ আভার পরিবর্ত্তে নবজাগরণের নবোজ্জ্বল সূর্য্য আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে। ক্ষণজন্মা রামমোহন রায় সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির যে ক্ষীণধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, আজ তাহাতে জোয়ার আসিয়াছে। কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই জোয়ার প্রতিরুদ্ধ করে।

এই নবজাগরণের দিনে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না। শুভ ভাব ও চিন্তার দ্বারা, শুভ কর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের দ্বারা নবজাগরণের সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত এই জগতের মধ্যে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত কর; নিজের জীবনতরীতে পাল তুলিয়া দাও এবং জোয়ারের সাহায্যে উন্নতি ও স্বাধীনতার পথে খরবেগে চলিয়া যাও। আত্মদৃষ্টির সমুজ্জ্বল প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া অমৃতধামের পথে অগ্রসর হও। আমাদের প্রত্যেকেরই ইহা উপলব্ধির বিষয় যে, আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরে অমৃতধামের যাত্রী হইবার, মৃত্যুর অতীত হইবার একটা স্বাভাবিক প্রবল ইচ্ছা সর্ব্বদাই জাগ্রত আছে। যদি মৃত্যুর অতীত হইতে চাও, তবে অগ্রসর হও। জাগরণের যে প্রবল জোয়ার আসিয়াছে, তাহার সম্মুখে নিদ্রা ও আলস্যের প্রশ্রয় দিলে মৃত্যু ও বিনাশ অপরিহার্য্য।

সংসারের এই রণক্ষেত্রে শ্রেয় ও প্রেয়ের, উন্নতি ও অবনতির, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কঠোর সংগ্রাম চলিয়াছে। এই রণক্ষেত্রে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে চাহিবে কে? পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেই তো মৃত্যু। এই দারুণ সংগ্রামে অগ্রসর হইলেই জীবনলাভ। জীবনলাভ করিতে যদি চাও, তবে অগ্রসর হও—প্রাণের মধ্যে এই মন্ত্রই আঁকড়াইয়া ধর; প্রাণের মধ্যে এই মন্ত্রই জাগাইয়া রাখ। অন্তরে এই প্রশ্ন স্পষ্টভাবে কর—নানা অবান্তর বিষয় আনিয়া প্রশ্নটীকে চাপা দিও না—বাঁচিতে চাও, অথবা মরিতে চাও? নিজ নিজ অন্তরে এই প্রশ্নের সমাধান চাও যে, মরণের অগ্নিতে পুড়িয়াও জীবনলাভ করিতে চাও, অথবা জীবনীশক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া জড়তা ও আলস্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে যক্ষ্মারোগীর মত নিজের অজানতই মৃত্যুপথের পথিক হইতে চাও? ইহা নিঃসন্দেহ যে, জিজ্ঞাসুমাত্রেই প্রাণের ভিতর হইতে এই উত্তরই পাইবেন যে, জীবনের নামে নামেমাত্র বাঁচিয়া থাকিয়া প্রকৃতপক্ষে মরণের পথে চলা অপেক্ষা মরণের অগ্নিতে শতবার পুড়িয়া অন্ততঃ একটীবারও প্রকৃত জীবনের আস্বাদ লাভ করা শ্রেয়স্কর।

মরণের পথ অতিক্রম করিয়া নবজাগরণের পথে চলিতে চাহিলে, আত্মদৃষ্টির প্রদীপ জ্বালাইয়া অমৃতধামের যাত্রী হইতে গেলে, বৃথা খেলায় মত্ত থাকিলে চলিবে না—দুর্ব্বলের ন্যায় সময়কে অবহেলায় বহিয়া যাইতে দিলে চলিবে না; মরণের মোহঘোরে আপনাকে হারাইয়া দিলে চলিবে না। কর্ত্তব্যের চরণে, ধর্ম্মের চরণে পলে পলে তিলে তিলে আপনাকে বলিদান করিতে হইবে। প্রতি মুহূর্ত্তে নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিজের প্রকৃত মঙ্গল, সমাজের প্রকৃত মঙ্গল, দেশের প্রকৃত মঙ্গল খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, এবং সেই সকল মঙ্গলের অনুষ্ঠানেই আপনাকে নিরত রাখিতে

হইবে, জগতের বিরাট ও মহান স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ মিলাইয়া লইতে হইবে। ধর্ম্ম তাঁহার বাম হস্তে তোমার সম্মুখে ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের উপায় প্রেয়কে ধারণ করিতেছেন; ধর্ম্ম তাঁহার দক্ষিণ হস্তে তোমার সম্মুখে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল ও স্বাধীনতার উৎস তাঁহার বরাভয়প্রদ শ্রেয়কে ধারণ করিতেছেন। নিজের অন্তরে জিজ্ঞাসা কর—কোন্‌টাকে প্রাণের ভিতর বরণ করিয়া লইবে? প্রেয়কে গ্রহণ কর—মৃত্যু তোমার হস্তগত—তাহার মধ্যে প্রকৃত জীবন পাইবে না; নিশ্চয় জানিও যে, ক্ষুদ্র স্বার্থের চরণে চিরদাসত্বের খতে তুমি স্বাক্ষর করিলে, এবং সেই দাসত্বের অপরিহার্য্য সঙ্গী অপমানের বোঝা তোমাকে মাথায় লইয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে।

প্রেয়কে বরণ করা, আর মরণের সঙ্গে খেলা করা একই কথা। মরণের সঙ্গে খেলা কর,—মরণ তাহার স্বভাবধর্ম্মে তোমার সমস্ত বল চুষিয়া পান করিবে, তোমার সমস্ত তেজ নিঃশেষে হরণ করিবে। কিন্তু এই সংসারে বলহীন ও মৃত্যুপথের পথিকের স্থান নাই। বলহীন মরণোন্মুখ ব্যক্তির প্রতি সংসারের লোক দুই চারিবার করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে, কিন্তু মানুষের উপযুক্ত স্থান অধিকার করিবার পথে, তাহার ন্যায্য অধিকার লাভের পথে তাহাকে সহায়তা করিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইবে না। প্রেয়কে বরণ করিবার ফলে দাসত্বের খতে স্বাক্ষর করিবার ফলে যে অপমানভার মাথায় লইয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার জন্য চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইলেও কেহই সেদিকে দৃক্‌পাতও করিবে না। ইহা চিরন্তন সত্য যে, সিংহও পীড়িত হইলে সকলের অবজ্ঞার পাত্র হইয়া পড়ে।

সংসারে যদি সত্যই বাঁচিতে চাও, জগতের মহাসভায় যদি মানুষের উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে চাও, দাসত্বকে যদি পদদলিত করিতে চাও, অপমানের বোঝা যদি মাথা হইতে নামাইয়া ফেলিতে চাও, তবে শ্রেয়কে বরণ করিতেই হইবে; প্রতি পদে মরিয়া-মরিয়াও নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার বল অর্জ্জন করিতে হইবে; মৃত্যুকে জয় করিতে হইবে; প্রতি পদে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে জগতের বিরাট স্বার্থের চরণে বলিদান করিয়া জগতের মঙ্গলসাধনে আপনাকে নিরত রাখিতে হইবে। এই ভাবে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতালাভের পথে তোমার নিজেকেও চালাইতে হইবে, এবং সেই সঙ্গে মানবমণ্ডলীকেও শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করিতে হইবে। ইহার ফলে তুমিই অবাক হইয়া দেখিবে যে, তোমারও মঙ্গলসাধনে, তোমারও বলবিধানে সমস্ত জগত অগ্রসর হইবে—পরস্পরের সাহচর্য্যে অগ্রসর হওয়াই ভগবানের মঙ্গল বিধান।

নিস্তরঙ্গ পুষ্করিণীতে যেমন সূর্য্যের সুবিমল প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ শ্রেয়ের ভিতরেই ধর্ম্মের বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব সম্যক উপলব্ধ হয়। শ্রেয়ের ভিতরেই ধর্ম্মের মূল কথা উপলব্ধি করি—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ধর্ম্মের কেন্দ্র হইলেন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরব্রহ্ম। তাই শ্রেয়কে অবলম্বন করিলেই আমরা ভগবানকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বিশ্বপিতা অখিলমাতা বলিয়া উপলব্ধি করি।

বর্ত্তমান যুগে সমগ্র জগতে শ্রেয় ও প্রেয়ের কঠোর দ্বন্দ্ব চলিয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের যেন মনে হয়, প্রাচ্য ভূখণ্ডে, বিশেষত ভারতভূমিতেই এই সংগ্রাম ধীরে ধীরে অধিক হইতে অধিকতর প্রগাঢ়তা লাভ করিতেছে। আজ দেখি, ভারতবাসীকে শ্রেয় ও প্রেয় দুই বিপরীত দিকে প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করিতেছে। শ্রেয় টানিতেছে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে, স্বাধীনতার দিকে, জীবনের পথে; প্রেয় টানিতেছে অবনতির দিকে, দাসত্বের দিকে, মরণের পথে। কিন্তু শ্রেয়ের ভিতরেই ধর্ম্মের সুবিমল ছায়া প্রকাশ পায় এবং সেই ধর্ম্মের মূল কেন্দ্র হইল ভগবানের উপাসনা—ব্রহ্মনাম। রাজা রামমোহন জানিতেন যে, একমাত্র পরব্রহ্মই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, তিনিই একমাত্র স্বাধীনপুরুষ; তিনি জানিতেন, সেই পূর্ণস্বাধীন ভগবানের ছায়া যে জাতিকে যে ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে, সেই ব্যক্তির সেই জাতিরই ভিতরে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার একটা বিরাট জাগরণ ফুটিয়া উঠিবে; তাঁহার নামের ভিত্তির উপরে গ্রথিত ধর্ম্মের বিজয়বার্ত্তা যেখানে

ঘোষিত হইবে, সেইখানে নিশ্চয়ই বিরাট সাড়া পড়িয়া যাবে। ইহা স্থির জানিয়াই ব্রহ্মনামকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি ব্রাহ্মসমাজের আকারে জাগরণের উৎস খুলিয়া দিলেন; দেশবাসীর জন্য শ্রেয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। বর্ত্তমান যুগে শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে সংগ্রামের অবসরে আমরা যদি সংযম প্রভৃতি অবলম্বনে পরস্পরের সাহচর্য্যে শ্রেয়ের পথে চলি; যদি শত ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে, সহস্র বিপদের মধ্যে, লক্ষকোটী বিপ্লবের ভিতরে ব্রহ্ম নামকে সত্যই হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখি, সত্যই যদি ভগবানকে আমরা মানবমাত্রেরই একই পিতামাতা বলিয়া মনে করি, তবেই আমাদের মুক্তি, তবেই সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও উন্নতি আমাদের হস্তগত; তবেই আমরা মরিতে মরিতেও বাঁচিতে পারিব। নচেৎ—মৃত্যু সম্মুখে।

আমরা উপনিষদের ঋষিদের নিকটে যুগযুগান্তর ধরিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করিবার, বিশ্বপিতা অখিলমাতা পরমেশ্বরকে মানবমাত্রের একই পিতা-মাতারূপে উপলব্ধি করিবার, উপদেশ পাইয়া আসিতেছি সত্য; আমরা প্রবন্ধে বক্তৃতায় পরস্পরকে শ্রেয় অবলম্বন করিবার, ভগবানকে সকলেরই একই সাক্ষাৎ পিতামাতা ও মানবমাত্রকে তাঁহার সন্তানরূপে জানিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিবার উপদেশ দিতেছি সত্য, কিন্তু আমরা কি সেই উপদেশ অনুসারে এখনও চলিতেছি? প্রকৃত পক্ষে আমরা শ্রেয়ের পথে চলি না, ভগবানকে সকলের সত্যই পিতামাতা এবং মানবমাত্রকে সত্যই পরস্পরের ভ্রাতা বলিয়া মনে করি না বলিয়াই আজ আমাদের এই দুর্গতি। মুখে আমরা ভগবানকে বিশ্বপিতা বলিলেও কার্য্যে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের পিতা, শূদ্রের পিতা, চণ্ডালের পিতা, ব্রাহ্মের পিতা, অব্রাহ্মের পিতা প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি। এতদিন যাহা দেখিয়াছি, তাহা দেখিয়াছি—এখন আর ভগবানকে বিভক্ত করিয়া দেখিবার সময় নাই। এখন ভগবানকে একই পিতামাতা জানিয়া পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলিয়া যাও—অন্যায় ঘৃণা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতিকে পায়ের তলে দলিয়া ফেল। 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' এই প্রবাদকে ভাষা হইতে মুছিয়া ফেলিয়া 'ভাই এক ঠাঁই,' এই প্রবাদকে সংস্থাপিত কর। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের সকলেরই দশা এক—উঠিতে হয়, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত, ব্রহ্মোপাসক হইতে ভূতোপাসক পর্য্যন্ত সকলে একসঙ্গেই উঠিব; মরিতে হয় আব্রাহ্মণচণ্ডাল সকলকে এক সঙ্গেই মরিতে হইবে। এই সত্য কথা ভুলিয়া যাই বলিয়াই আমরা পরস্পর মিলিতে পারিতেছি না। কিন্তু ইহা অতীব সত্য—আমরা সকলেই জানি যে ইহা অতীব সত্য। এখনও সময় আছে—এখনও যদি আমরা এই সত্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরস্পরের মধ্যে অন্যায় ভেদাভেদ-জনিত "একমুটো পার্থক্যের" ব্যবধান বিদূরিত করিয়া দিই, বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার স্ত্রীশূদ্রব্রাহ্মণ-চণ্ডাল প্রভৃতি সকলেরই সম্মুখে সমানভাবে অবারিত করিয়া দিই, সকলে মিলিতভাবে পরস্পরের সাহচর্য্যে যদি আমরা সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হই, তবে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা, উন্নতি, মুক্তি সমস্তই অচিরে হস্তগত হইবে—কেহই তাহা প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিবে না।

অগ্রসর হও। যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু মঙ্গল, তাহাতেই সমস্ত মনপ্রাণ, সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর। সত্যের পথে, কল্যাণসাধনের পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হও—কোনও সূত্রেই তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইও না। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র কথায় বলিবার অবসর নাই—উঠ, জাগ। জাগরণ তো আসিয়াছে—এখন আর নিদ্রা আলস্যকে অবলম্বন করিলে চলিবে না। আমাদের প্রত্যেককে জ্ঞান-ধর্ম্মে উন্নত হইয়া আত্মদৃষ্টির প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ পরমাত্মার পথকে ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মঙ্গলবিধাতা ভগবানকে সত্যই পিতামাতা বলিয়া জান, তাঁহার উপর সত্যই সন্তানের উপযুক্ত একান্ত নির্ভর কর, এবং তাঁহার অটুট আদেশ জানিয়া সত্য হইতে মঙ্গলের পথ হইতে কদাপি বিচ্যুত হইও না। দেশবাসী প্রত্যেককে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হইবার পথে পরিচালিত কর। যাহারা জ্ঞানে ধর্ম্মে অর্থে পশ্চাতে পড়িয়া আছে, ভুলভ্রান্তিবশত যাহারা সত্য হইতে ধর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া গিয়া নয়নজলে বুক ভাসাইতেছে, তাহাদিগকে যথাশক্তি তুলিয়া ধর, তাহাদের

প্রতি প্রসন্নমুখে তোমার দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া দাও। তবেই দেখিবে, দেশের দুঃখদৈন্য, দেশের মৃত্যু-হাহাকার অচিরেই অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

মাকড়সা যেমন সময়ে সময়ে আপনার জালে আপনাকে জড়াইয়া ফেলে, চক্ষু খুলিয়া দেখিলেই দেখিব যে, আমরাও সেইরূপ সামাজিক প্রভৃতি নানাবিধ অনাচার কদাচারের উপকরণে কারাগার সংগঠিত করিয়া তাহারই মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, এবং সেই কারাগার হইতে স্বাধীনতা চাই, মুক্তি চাই বলিয়া চীৎকার করিতেছি। কে শুনিবে তোমার সেই সমস্ত বৃথা প্রলাপ চীৎকার? ভগবান তোমার অন্তরে জ্ঞানের যে অস্ত্র দিয়াছেন, সেই অস্ত্রের দ্বারা দেখিতে সুসাধ্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুর্ভেদ্য স্বরচিত কারাগার ভাঙ্গিয়া ফেল, দেখিবে, তাহার মহা ঝনৎকারে শত কারাগারের লৌহকবাট সহজেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। মহাসাগর হইতে একঘটী জল তুলিলেও সমস্ত মহাসাগর যেমন উদ্বেলিতহৃদয়ে তাহার সঙ্গে সমুত্থিত হইতে চায়, সেইরূপ তুমি সত্যের পথে চল, ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হও—দেখিবে, তোমার চতুষ্পার্শ্বও তোমারই সঙ্গে সঙ্গে সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমান যুগে দেশের যেরূপ অবস্থা আসিয়াছে, মৃত্যু যেরূপ মুখব্যাদান করিয়া তাহার করাল কবলে দেশকে সর্ব্বতোভাবে গ্রাস করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও—দেশবাসীর কর্ণে এই এক মন্ত্র ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মন্ত্র দিতে পারি না। ভগবান এই বাণী আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে জাগাইয়া তুলিয়াছেন—এই বাণীই আমাদের সকলকে কৌস্তুভ মণির ন্যায় অন্তরে ধারণ করিতে হইবে। যতদিন না সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হস্তগত হয়, ততদিন আমার এই কাতর মিনতি, বৃথা হাসি-খেলায়, অশ্লীল আমোদপ্রমোদে গা ভাসাইয়া বৃথা সময় নষ্ট হইতে দিও না; ভায়ে-ভায়ে বৃথা দ্বন্দ্ববিবাদ করিয়া নিজের শক্তির দেশের শক্তির অপচয় হইতে দিও না। ধর্ম্মের খোসা লইয়া বৃথা ধার্ম্মিকতার ভাণ করিও না। ছুঁৎমার্গ অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি পদদলিত করিয়া দাও। ধর্ম্মের নামে সদাচারের নামে মানুষের উপর যে অপমান আনয়ন কর, সে অপমান মানুষের উপর নহে,—সে অপমান, মানবের যিনি পিতামাতা, সেই বিশ্ববিধাতা ভগবানেরই উপর গিয়া লাগে। মানুষ যখন মানুষের উপর অপমানের সূত্রে ভগবানেরই অপমান করে, তখন বলা বাহুল্য যে, ভগবানের বিধানেই মানুষ অবনতির মোহজালে পড়িয়া অজ্ঞানকূপে ডুবিতে থাকে। কিন্তু তোমরা যদি প্রকৃত মানুষ হও, ভারতের মুনিঋষিদের সন্তান ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারী বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে কর, এবং ভগবানকে যদি সত্যই পিতামাতা বলিয়া জান ও মনে কর, তবে সকল উন্নতির অদ্বিতীয় উৎস সত্যধর্ম্মের সাধনপথে অগ্রসর হও, দেশবাসীকে সত্যধর্ম্মের পথে পরিচালিত কর এবং নিজের মনুষ্যত্বকে সার্থক কর।

আজ আমি আর নূতন কথা কি বলিব? ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া কেবল এইমাত্র বলিতে পারি—ভগবানের হস্তে ফলাফলের ভার সমর্পণ করিয়া নিজের মঙ্গলসাধনে, সমাজের ও দেশের কল্যাণসাধনে একমনে একপ্রাণে আপনাকে নিয়োগ কর। দ্বেষহিংসা বিদূরিত করিয়া পরস্পরকে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা কর। অসত্য, অধর্ম্ম হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে এবং সন্তানগণকেও সর্ব্বদা দূরে রাখিবে। ধর্ম্মের খোসামাত্রে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে প্রাণের ভিতর ধরিয়া থাকিবে। তখন দেখিবে, স্বরাজ হস্তগত হইয়াছে, স্বাধীনতা হস্তগত হইয়াছে, উন্নতির সুবিস্তৃত রাজপথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। তখন দেখিবে, দাসত্বের খত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে; অপমানের বোঝা সহসা মাথা হইতে নামিয়া গিয়াছে। তখন ভগবানের অমোঘ আশীর্ব্বাদ দেশের মস্তকে ঝরিতে থাকিবে; দেশ সজীব হইয়া উঠিবে, শ্রদ্ধা-ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম্মের সাহায্যে সকল সদ্গুণের আধার হইয়া উঠিবে; সমগ্র দেশে দুঃখদৈন্যের হাহাকার ও ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে আনন্দের হাসি এবং শুভ অনুষ্ঠানসমূহের মঙ্গলশঙ্খ আবার বাজিয়া উঠিবে।

উৎসবের উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ এই উৎসবের দিনে আমার হৃদয় যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের মধ্যে আন্দোলিত হইতেছে। বিষাদের কারণ এই যে, যাঁহাদের স্মৃতি বলিতে গেলে এই ব্রহ্মমন্দিরের প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ডের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে; যাঁহাদের বক্তৃতা ও সঙ্গীতে এই ব্রহ্মমন্দির বৎসরের পর বৎসর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে; যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, আজ তিন বৎসর যাবৎ তাঁহারা একে একে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, পরম পিতা ভগবানের এরাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মঙ্গল কার্য্য সাধনের জন্য মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মাঘোৎসবে যাঁহার তেজঃপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া কত লোক অন্ধ কুসংস্কারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, এবং যাঁহার প্রাণস্পর্শী নূতন নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া কত লোকের চিত্ত ভগবচ্চরণে ব্যাকুলভাবে ধাবিত হইয়াছে, সেই পূজ্যপাদ সত্যেন্দ্রনাথ গতপূর্ব্ব বৎসর আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। উৎসব-সভায় সঙ্গীত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যাঁহার রাগিণীর আলাপ শ্রবণ করিয়া উপাসকমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন, আজ সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কোথায়! আবার, এই ব্রহ্মমন্দির যাঁহার উপদেশের গুরুগম্ভীর নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত; এই ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত যাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া কত লোকের চিত্ত সংশয়মুক্ত হইয়া ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, আজ কয়েকদিন হইল, সেই আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া পরমপিতার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

এই দারুণ বিষাদের মধ্যেও আজ আমার হৃদয়ে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। আনন্দের কারণ এই যে, আজ বহুকাল পরে এই ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইতেছে। প্রত্যক্ষ কর যে, এই ব্রহ্মমন্দিরের প্রত্যেক ধূলিকণা ব্রহ্মনামের অরুণরাগে রঞ্জিত। রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক এই ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, ইহারই বেদী হইতে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সপ্তাহে সপ্তাহে নিয়মিতরূপে ধর্ম্মব্যাখ্যা প্রদান করিয়া ব্রহ্মোপাসনার ক্ষীণধারাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মমন্দিরেরই বেদী হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার "ব্যাখ্যানের" অমৃতধারার উৎস খুলিয়া দিয়াছিলেন; এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের "উপদেশের" জ্ঞানবারি বহুকাল ধরিয়া বিতরিত হইয়াছিল। এই ব্রহ্মমন্দিরেরই বেদী হইতে সদানন্দ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার সুমিষ্ট উপদেশের রসধারা বহাইয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে পবিত্রভাবে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র দেশবিদেশকে ভাসাইয়া দিয়া শ্যামল ও পূত করিয়া তুলিয়াছিলেন, স্মরণ করিলেও আনন্দ হয় যে, এই ব্রহ্মমন্দিরেই তাহার সূত্রপাত হয়।

এই সকলের স্মৃতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবানের সম্মুখে তোমাদের হৃদয়খানি পাতিয়া দাও। আজ এই সুন্দরপ্রভাতে সংসারের চিন্তায় হৃদয়কে রুদ্ধ রাখিও না—ভগবানের আলোক হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দাও, ভগবানকে সমস্ত হৃদয় অধিকার-করিতে দাও। আজ প্রত্যক্ষ কর, বিশ্বযজ্ঞের পুরোহিত আজ তোমাদের এই প্রীতিযজ্ঞে অতিথি হইয়া আসিয়াছেন—তাঁহাকে আজ হৃদয়ের পূজা না দিয়া ফিরাইয়া দিও না। আজ তোমাদের হৃদয় হইতে সেই জীবনসখার নামে জয়গান সমুত্থিত হইয়া এই সুন্দর প্রভাতের সূর্য্যকিরণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গগন ছাইয়া ফেলুক। তোমাদের হৃদয়মন তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠুক।

অমৃতধামের যাত্রী হইয়া আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি। আমাদের কেহই যেন পশ্চাতে পড়িয়া না থাকি। পরস্পরকে অগ্রসর হইবার মন্ত্রে উৎসাহিত কর এবং অগ্রসর হও। খেলায়, কৌতুকে, সংসারের নানা বিষয়ে আমরা প্রত্যেকে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করি; আজ আমাদের দেখিতে হইবে, আমাদের মধ্যে কে সর্ব্বপ্রথম পূততম হৃদয় লইয়া জননীর চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিতে পারে। যাঁহার এই প্রকৃতি, যাঁহার এই ধনধান্যে পূর্ণ ধরণী, তিনিই আমাদের প্রত্যেকের পিতা, প্রত্যেকের মাতা। তিনিই আমাদের রক্ষক; তিনি আমাদিগকে তাঁহার স্নেহপ্রেমের রক্ষাকবচে ঘিরিয়া রাখিয়া নিয়তই রক্ষা করিতেছেন। সেই অমৃত পুরুষের অমৃত-

ধারায় অভিষিক্ত হইয়া মৃত্যুকে অতিক্রম কর। এখানে সত্যসত্য মৃত্যু নাই—এখানে ভয় আছে, বিভীষিকা আছে। ভয়ই তো মৃত্যু। সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া চল—ভয় বিদূরিত হইবে; মানুষের প্রতি কথায় বিভীষিকা তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। যাঁহার নামে আজ আমাদের প্রাণ জাগিয়াছে, নিশ্চয়ই জানিও যে, তিনিই আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মসংগ্রামে নেতা, তিনিই আমাদের কল্যাণকারী সেনাপতি। সেই সেনাপতি আমাদের এই সম্মুখে তাঁহার অজেয় পতাকা স্থাপিত করিয়াছেন। কে তোমাদের মধ্যে সেই পতাকা বহন করিয়া অগ্রসর হইতে চাও—জীবন লাভ করিতে চাও, মৃত্যুর বিভীষিকা এড়াইতে চাও? এই পতাকা-স্কন্ধে অগ্রসর হইলে সঙ্গে সঙ্গেই অভয় তো পাইয়া যাইবে। ভগবানে বিশ্বাসী বন্ধুগণ! বিধাতার মঙ্গলবিধানে যদি সত্যই তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তবে আমাদের উপাসকমণ্ডলীর সংখ্যায় অল্পতা দেখিয়া তোমরা মুহ্যমান হইও না। তোমরা অগ্রসর হও—মণ্ডলীর সংখ্যাই কেবল বৃদ্ধি পাইবে না, কিন্তু মণ্ডলী সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। সেই করুণাময়ী জননীকে চিত্তকমলে সুপ্রতিষ্ঠিত কর, তোমাদের সমস্ত দুঃখ সমস্ত দৈন্য নিশ্চয়ই চলিয়া যাইবে; তোমাদের প্রাণের কাতরতা নিশ্চয়ই বিদূরিত হইবে। আজ এখানে যে উৎসব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল, ভগবানের চরণে আমাদের এই প্রার্থনা সমুত্থিত হউক—হে ভগবান! এই ব্রহ্মমন্দির হইতে কোন সূত্রে যেন তোমার নামের উৎসব অন্তর্হিত না হয়। হে ভক্তবৎসল! তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমাদের এই মণ্ডলী রাজা রামমোহন রায়ের জ্ঞানে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিতে এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কর্ম্মে পরিপুষ্ট হইয়া অচিরেই জয়যুক্ত হয়।

গান।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

দরবারী কানেড়া—তেওরা।

অসীম সঙ্কটে ভরসা ভগবান,
হে বীর! নির্ভয়ে হওনা আগুয়ান।
বিপুল বোঝা যার—সবল হৃদি তার,
বহিতে সক্ষম সকল গুরুভার;
অগাধ জ্ঞানময় উদার সদাশয়,
জগত-নাথ যিনি—এ বোঝা তাঁরি দান।
তাঁহারি কৃপা লাভে বোঝা সে সোজা হয়,
ঘুচাও সব ভয় তাঁহারি গাহি জয়;
কাটিবে সঙ্কট বিমল নামে তাঁর,
অভয়ামৃত-সেতু তাঁহার নামগান॥

কেশরীবংশ ও গঙ্গাবংশ।

(রায়মহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায় বি-এল)

কেশরীবংশের রাজ্য দৈর্ঘ্যে ১৮৫ মাইল এবং প্রস্থে ৬০ মাইল মাত্র বিস্তৃত ছিল। বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী 'কাঁশবাঁশ' নদী হইতে গঞ্জামের নিকটবর্ত্তী 'ঋষিকুল্যা' নদী মধ্যে এই রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল। সমুদ্র হইতে ঢেঙ্কানল পর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত করিলে এই রাজ্যের প্রস্থ-রেখার পরিমাণ পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমানে এই সংকীর্ণ ভূখণ্ডের রাজস্ব এবং সর্ব্বপ্রকার আয়ে অতি কষ্টে শাসন-ব্যয় সঙ্কুলান হয় মাত্র, উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না।

কেশরীবংশীয়দিগের সৈন্য সামন্ত ও পূর্ত্তবিভাগের অপরিমিত ব্যয় কিরূপে সংকুলান হইত তাহা একটী সমস্যার বিষয়। তবে স্বাধীন ও পরাধীন দেশের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সে সময় দেশের অর্থ এখনকার মত বিদেশে চলিয়া যাইত না, বৎসর বৎসর দেশের অর্থ দেশেই সঞ্চিত হইত। ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা কেশরী রাজগণের বহু অর্থাগম হইত। মহানদী বা চিত্রোৎপলার কূলে কোন অজ্ঞাত স্থানে সে সময় একটী হীরকের আকর ছিল। এবং সেই আকর হইতে প্রতিবৎসর বহুল পরিমানে মূল্যবান্ হীরকখণ্ড বিদেশে রপ্তানী হইত। দেশে জমিদার বা মোকদ্দমা প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল না। দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা কেশরীরাজের অঙ্গুলিচালনায় দেশের সমুদয় সামর্থ্য কোন অনুষ্ঠেয় কার্য্যে নিয়োজিত হইত; এই সকল কারণেই কেশরীবংশীয় নরপতিগণ অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন রাজ্যের রাজা হইয়াও বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন; এবং তাঁহাদের সুখ-সৌভাগ্য দেখিয়া বহু বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের শাসনকর্ত্তাগণও ঈর্ষ্যান্বিত হইতেন।

কেশরীবংশের পর গঙ্গাবংশের অভ্যুত্থান হয়; মতান্তরে, এই উভয় বংশের মধ্যে সূর্য্যবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করেন। এই সূর্য্যবংশের অষ্টম নৃপতি কোনার্কে ১০৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করেন। কোনার্ক

উড়িষ্যার সূর্য্যক্ষেত্র। ইহার সম্বন্ধে এই প্রসিদ্ধি আছে যে, কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব উৎকট পাপের ফলে মহাব্যাধি-গ্রস্ত হন। অনন্যোপায় হইয়া তিনি এই স্থানে একাগ্র মনে সূর্য্যের উপাসনা করেন, এবং সূর্য্যের বরলাভ করিয়া রোগমুক্ত হন। স্থানটী বালুকাসংকুল, কিঞ্চিৎ দূরে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। স্বল্পতোয়া চন্দ্রভাগা নদী, এই বালুকারাশি ভেদ করিয়া কায়ক্লেশে সমুদ্রের দিকে বহিয়া যাইতেছে। মাঘী সপ্তমীর দিন এই স্থানে একটী মেলা বসে এবং বহুলোকের সমাগম হয়। সূর্য্যোদয় দর্শন ও চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করা সেদিন সমস্ত যাত্রী-দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। সূর্য্যোপাসনার জন্য এই একদিন মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সূর্য্য বৈদিক দেবতা; বেদ ও পুরাণে তাঁহার উপাসনার উল্লেখ আছে। কিন্তু সমগ্র উড়িষ্যায় কোনার্কের মন্দির ছাড়া আর কোথাও উল্লেখযোগ্য সূর্য্যমন্দির নাই। পুরীতে জগন্নাথ দেবের প্রাঙ্গণ মধ্যে দুইটী সূর্য্যমন্দির আছে; একটী মুক্তিমণ্ডপের ও অন্যটী লক্ষ্মীমন্দিরের নিকট-বর্ত্তী। শেষোক্ত মন্দিরে যে সূর্য্যদেবতার মূর্ত্তি আছে, তাহা কোনার্ক মন্দির হইতে আনীত বলিয়া প্রবাদ আছে, এবং তাহার পূজার জন্য পূজককে কতক নিষ্কর ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। মুক্তিমণ্ডপের নিকট যে মন্দির আছে, তাহাতে প্রথম সূর্য্যদেবের পূজা না হইলে জগন্নাথদেবের পূজা আরম্ভ হয় না। এইস্থানে আর একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যার অনেকের বিশ্বাস যে কোনার্ক মন্দিরে কোন দেবতার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। প্রবাদ আছে, মন্দির নির্ম্মাণকারী শিল্পী বিরক্তি-ভাবে তাহার পুত্রকে জোরে চপেটাঘাত করায় সে মন্দিরের উপরিভাগ হইতে গড়াইয়া নীচে পড়িয়া যায় ও সেই আঘাতে প্রাণত্যাগ করে। মন্দির সমাপ্তির পূর্ব্বে দৈবাৎ একব্যক্তির প্রাণবিনাশ ঘটায় মন্দিরে দেবতার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কিন্তু এই জনশ্রুতি খুব সম্ভব অলীক। মূল মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ উত্তম-রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে অন্যান্য ব্যবহৃত মন্দিরের ন্যায় উহার মেঝের পাথরগুলি ব্যবহারে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরের নিকট যে সূর্য্যমন্দির আছে, তাহার দেবতা কোনার্ক হইতে আনীত বলিয়া পাণ্ডাদিগের নিকট প্রসিদ্ধি আছে, এবং তাহার ভোগের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত আছে। লক্ষ্মী দেবী ব্যতীত প্রাঙ্গণস্থিত অন্য কোন পার্শ্ব দেবতার পৃথক ভোগের বন্দোবস্ত নাই। এই সকল কারণে আমার মনে হয় যে কোনার্কের সূর্য্যমন্দির কোনও বিজাতীয় আক্রমণকারী কর্ত্তৃক কলুষিত হয়; সেই আক্রমণকারীরা ধনলোভে চক্রের নিয়স্থিত বৃহৎ অয়স্কান্ত প্রস্তরখানি খুলিয়া লয়। মন্দির আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে পূজকেরা সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি অন্তর্হিত করে।

নিত্য-নৈমিত্তিক পূজায় সূর্য্যের পূজা করিতে হয়; গণেশ আদি পঞ্চদেবতার মধ্যে সূর্য্য অন্যতম। প্রাতে মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে প্রত্যেক সদ্‌ব্রাহ্মণই পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্রে সবিতৃদেবের ধ্যান করিয়া থাকেন। অতএব সূর্য্যবংশীয় রাজার পক্ষে সূর্য্যদেবের উপাসনার জন্য কোনার্কের মন্দির নির্ম্মাণ করা কোনও ক্রমে অস্বাভাবিক নহে। উড়িষ্যার অন্তর্গত 'সোরো' নামক স্থানে অতি প্রাচীন সূর্য্যমন্দিরের বিশাল ভগ্নস্তূপ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ সময়ে সোরোর সূর্য্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন; তবে কোন এক সময়ে উড়িষ্যায় সূর্য্যোপসনার প্রচলন ছিল এরূপ অনু-মান করা অসঙ্গত নয়।

কোনার্কের সূর্য্যমন্দির উৎকলীয় শিল্পকলার মুকুট-মণি। এই মন্দিরের শিল্পচাতুর্য্য ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। মন্দিরটী রথের আকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার কার্ণিশে এবং দ্বারের পার্শ্বদেশে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারুকার্য্য রহিয়াছে, তাহার তুলনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মন্দিরগাত্রে যে সকল জীব-জন্তুর ও মনুষ্যের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে তাহা স্বভাবের প্রতি-চ্ছবি না হইলেও অস্বাভাবিক বলিয়াও মনে হয় না। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের মধ্যস্থলে শিল্পকলার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। স্বভাবের প্রতিচ্ছবি যদি শিল্পকলার চরমোৎকর্ষ হইত, তাহা হইলে ছায়াচিত্র বা ফটোগ্রাফ উচ্চাঙ্গের চিত্রবিদ্যা বলিয়া গণ্য হইত। উৎকৃষ্ট কলা-বিদ্যার অভিব্যক্তিতে স্বভাবের সহিত ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শকগণ মনে করেন, তাঁহারা ইতি পূর্ব্বে এইরূপ কোন বস্তু দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন তাহা স্মরণ করিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে উৎকৃষ্ট শিল্পকলার অভিব্যক্তি দর্শকের মনোভাবেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ভুবনেশ্বর এবং যাজপুরের শিল্পকলায় বৌদ্ধদিগের অনাসক্তি এবং নির্লি-প্ততা পরিস্ফুট, কিন্তু কোনার্কের শিল্পকলায় সে ভাব নাই। শৈবধর্ম্মের প্রভাবে ও তন্ত্রোক্ত ভোগমার্গের সাধনায় বোধ হয় লোকের মন সংসারযাত্রার দিকে ফিরিয়াছিল, তাই কোনার্কের শিল্পকলা যাজপুর ও ভুব-নেশ্বরের শিল্পকলা অপেক্ষা অধিক স্বাভাবিক। ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহু শিল্পকলাবিশারদ কোনার্কের শিল্পকলার অজস্র প্রশংসা করিয়া থাকেন। বস্তুত এই মন্দিরে উৎকলীয় স্থপতিবিদ্যা ও তক্ষণশিল্পের চরম উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।

কেশরীবংশের প্রবর্ত্তিত শৈবধর্ম্ম বহু বৎসর ধরিয়া

উড়িষ্যার রাজধর্ম্ম ছিল, কিন্তু উহা কোন দিন বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম হইয়াছিল। বহু শতাব্দী বৌদ্ধভাবাপন্ন থাকিবার ফলে সাধারণ লোকে বোধ হয় তন্ত্রোক্ত শৈব এবং শাক্তধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থাবান হইতে পারেন নাই। বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত অহিংসা ধর্ম্ম ও ভাবপ্রবণতা এদেশের লোকের মতিগতির সহিত যেরূপ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছিল, তন্ত্রোক্ত উৎকট সাধনমার্গ সেরূপ রুচিকর হয় নাই। গঙ্গাবংশের প্রভাবে উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইলে বৌদ্ধভাবাপন্ন জনগণ ভক্তির সহজ মার্গ অবলম্বন করিয়া যেন শান্তিলাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব-প্রভাবে উড়িষ্যার লোকে স্থির ধীর ও কোমলস্বভাবাপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা বৈরাগ্যের ধুয়া ও কর্ম্ম-ক্লান্তির অবসাদ তাহাদিগকে অল্পবিস্তর সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বোধ হয় এই অবসাদ ও মিথ্যা বৈরাগ্যের জন্যই উৎকলবাসীদিগের জাতীয় জীবন কোন দিন পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই এবং অল্প দিনের মধ্যেই গঙ্গাবংশের তিরোভাবের সহিত উৎকলের স্বাধীনতার অবসান হইয়াছিল।

১১৩২ হইতে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশের রাজত্ব-কাল। এই বংশের শাসনে উৎকলীয় সভ্যতা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, গঙ্গাবংশের প্রথম রাজা গঙ্গার উপকূল হইতে উড়িষ্যাদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়াই এই বংশের নাম গঙ্গাবংশ হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট প্রমাণ নাই। 'গ্রাল' নামক একজন বিখ্যাত রাজা উত্তর-ভারতের কোন স্থান হইতে আসিয়া অন্ধ্রদেশের উপকূলে রাজ্যস্থাপন করেন। সেই রাজার বহু নৌবহর ছিল এবং এই সকল নৌবহর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ অবলীলাক্রমে ভেদ করিয়া দেশ-দেশান্তর হইতে নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার আনয়নপূর্ব্বক রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিত। তাঁহার পুত্র চোড়ঙ্গদেব ১১৩২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা-বিজয় করেন। বোধ হয় তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াই এদেশে আসিয়াছিলেন। কারণ ইহার ৫০ বৎসরের মধ্যেই পুরীর বর্ত্তমান মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। চোড়ঙ্গদেব একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। উড়িষ্যাবিজয়ের পরেই তিনি বহু সৈন্য-সামন্ত লইয়া বঙ্গদেশের দিকে অগ্রসর হন এবং অল্পদিনের মধ্যে বর্দ্ধমান হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসেন। এই বিজয়ের দ্বারা তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হয়।

তমলুক তখন একটী সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। এই বন্দর হইতেই ধনপতি সওদাগর ও তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত লঙ্কাদ্বীপে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। চীনপরিব্রাজক হুয়েন্‌সাঙ্‌ সপ্তদশ শতাব্দীতে তমলুকে আসিয়াছিলেন; সে সময় তমলুক পূর্ব্বোপকূলে সর্ব্বপ্রধান বন্দর ছিল। ময়ূরভঞ্জের ময়ূরবংশীয় রাজা কিছুদিন তমলুক দখল করিয়াছিলেন, পরে কালু ভুঞা নামক এক ব্যক্তি উড়িষ্যা দেশ হইতে গিয়া তমলুকে রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও তমলুকে বাস করিতেছেন। তমলুক গঙ্গাবংশের রাজ্যভুক্ত হওয়াতে গঙ্গাবংশের রাজস্ব বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। গঙ্গার মোহানা হইতে গোদাবরীর মোহানা পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। যথা—(১) বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, (২) মধ্য উড়িষ্যা বা উৎকল, (৩) মান্দ্রাজ উপকূল। প্রথম দুইটী প্রদেশ হইতেই রাজস্বের অধিকাংশ আদায় হইত। মান্দ্রাজ উপকূল লইয়া গঙ্গাবংশের রাজত্ব কালে বহু যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। এই প্রদেশটী অধিকাংশ সময় নামমাত্রই গঙ্গাবংশের অধীনে ছিল; কিন্তু সুশাসন ও শৃঙ্খলা কোন দিন এই প্রদেশে চিরস্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ের মত কতকগুলি 'করদ-মিত্র' রাজ্য নামমাত্র গঙ্গাবংশের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল। দুর্ভেদ্য গিরিসঙ্কটবহুল এই সকল মিত্ররাজ্যকে করায়ত্ত করিবার প্রয়াস গঙ্গাবংশীয়গণ কোন দিন করেন নাই। তবে বাৎসরিক করদান ব্যতীত আপদ-বিপদের সময় এই সকল মিত্র-রাজ্য সৈন্যসাহায্য দান করিয়া গঙ্গাবংশীয়দিগের সহায়তা করিত। বর্ত্তমান ইংরাজশাসনের অধীনে যে কয়টী 'গড়যাত' বা মিত্ররাজ্য আছে, গঙ্গাবংশীয়দিগের সময়েও প্রায় সেই সমস্ত মিত্ররাজ্য ছিল। বৈষ্ণবধর্ম্ম ও জগন্নাথ মহাপ্রভুর প্রভাব দেশময় বিস্তৃত হইলে পর পরবর্ত্তী গঙ্গাবংশীয়গণ 'দেবরাজা' বলিয়া দেশের সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইতেন; তাঁহাদিগের প্রতি মিত্ররাজগণের আন্তরিক ভক্তি ও প্রগাঢ় স্নেহ ছিল।

১৪৭৯ হইতে ১৫০৪ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমদেব উৎকলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বধর্ম্মনিরত ও ভক্তিমান রাজা ছিলেন। জগন্নাথদেবের সেবায় তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি আপদে বিপদে এবং সকল ব্যাপারেই তাঁহার হৃদয়দেবতার অনুমতি লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। রাজ্যশাসন ও দেশবিজয় প্রভৃতি গুরুতর রাজকার্য্যের অভ্যন্তরে তাঁহার দেবতার ইচ্ছা যাহাতে পূর্ণ হয় সেই জন্যই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। এই রাজার রাজত্বকালে আমরা রাজনীতি ও ধর্ম্মভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিতে পাই। তাঁহার রাজত্বের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা কাঞ্চীবিজয়। কাঞ্চীরাজের পরমা সুন্দরী কন্যা পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করিবার আশায় পুরুষোত্তমদেব তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন; দূত

অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। কাঞ্চী-রাজ জাত্যংশে পুরুষোত্তমদেবের অপেক্ষা উচ্চ ছিলেন। সেই গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া দূতকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "আমি ঝাড়ুদার রাজার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব না"। কুলপ্রথা অনুসারে পুরীর রাজগণ রথের দিন রথের সম্মুখে ঝাড়ু দিয়া নিজেদের দৈন্য ও মহাপ্রভুর মহিমা প্রচার করিতেন। এই কুলপ্রথাকে লক্ষ্য করিয়া কাঞ্চীর রাজা তাঁহাকে ঝাড়ুদার বলিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তমদেব এই মর্ম্মান্তিক অপমানের প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কাঞ্চীবিজয় করিয়া পদ্মাবতীকে কোন ঝাড়ুদারের হস্তে সমর্পণ করিবেন। তিনি তাঁহার সমস্ত বাহিনী সমবেত করিয়া কাঞ্চী অভিমুখে অভিযান করিলেন। প্রবাদ এই যে, স্বয়ং জগন্নাথ কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে এবং তাঁহার ভ্রাতা বলভদ্র শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সামান্য সৈনিকের বেশে রাজবাহিনীর অগ্রবর্ত্তী রূপে পুরী হইতে কাঞ্চী নগরে গিয়াছিলেন। চিল্কাহ্রদের পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলে 'মাণিকপাটনা' নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। সেই গ্রামে 'মাণিক্য' নামক এক গোপকন্যা বাস করিত। মহাপ্রভু তাহার পসরা হইতে দধি গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজের স্বর্ণাঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন এবং রাজার নিকট সেই স্বর্ণাঙ্গুরীয় দেখাইয়া দধির মূল্য গ্রহণ করিতে বলিলেন। রাজা অঙ্গুরীয় দেখিয়াই উহা মহাপ্রভুর অঙ্গুরীয় বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং সেই সময় হইতে অভিযানের ফলাফলের বিষয়ে সমস্ত সন্দেহ তাঁহার মন হইতে দূর হইল। যথাসময়ে কাঞ্চীবিজয় হইল এবং রাজকন্যা পদ্মাবতী বন্দিনী হইয়া রাজার সমীপে আনীতা হইলেন। রাজা মন্ত্রীকে রাজকন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং যথাসময়ে তাঁহাকে কোন এক ঝাড়ুদারের হস্তে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অভিযানের পূর্ব্বে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা জগন্নাথদেবের অনুগ্রহে রক্ষা করিতে পারিলেন বলিয়া তাঁহার মন হর্ষে উৎফুল্ল হইল।

পরবর্ত্তী রথযাত্রার দিন রাজা কুলপ্রথানুসারে রথের সম্মুখস্থ রাজবর্ত্মে ঝাড়ু দিতেছেন—চারিদিক্ লোকে লোকারণ্য; মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি রথে বিরাজ করিতেছে। মন্ত্রী সেই সময় পদ্মাবতীকে লইয়া রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ আপনার আদেশে এই রাজকন্যাকে আপনারই হস্তে সমর্পণ করিয়া আমার কর্ত্তব্য পালন করিলাম। আপনিই ইহাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া ধন্য হউন।" রাজা নিজ আজ্ঞা স্মরণ করিয়া অগত্যা পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। পুরুষোত্তমদেব ও পদ্মাবতীর বিবাহিত জীবন সুখময় হইয়াছিল। তাঁহাদের পুত্র ধার্ম্মিকপ্রবর ও বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকাল চিরকাল উৎকলীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিবে।

রাজা প্রতাপরুদ্রদেব ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল রাজ্যের সর্ব্বত্রই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী স্বাধীন ভূপতিগণ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভয় করিতেন এবং কেহই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইতেন না। ধর্ম্মে কর্ম্মে, বলে বীর্য্যে তৎকালীন কোন নরপতি তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকাল উড়িষ্যার ইতিহাসে অতি গৌরবের সময়। তিনি উৎকলীয় ইতিহাসের মধ্যাহ্নসূর্য্য। তাঁহার তিরোধানে দেশে যে ঘোর অন্ধকার আসিয়াছিল, তাহার ছায়া আজিও উৎকলদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(অধ্যাপক ৺অভয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী নিবন্ধের শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি. এইচ-ডি কৃত অনুবাদ)

(৫) "তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বম্, মণিবৎ"—অর্থাৎ "ঈশ্বরের সান্নিধ্যহেতুই প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্য, যেরূপ অয়স্কান্তমণির পক্ষে"। এই সূত্রটী এই প্রশ্নের উত্তর যে—যদি ঈশ্বর সর্ব্বদাই প্রকৃতিতে বর্ত্তমান থাকেন এবং প্রকৃতির ক্রমাভিব্যক্তির পরিচালক হন, তাহা হইলে কিরূপে তিনি অপ্রত্যক্ষ হন? এবং ইহার দ্বারা এই বুঝায় যে, যেমন অয়স্কান্তমণির সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া লৌহ অয়স্কান্তমণির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় এবং অপর লৌহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ ঈশ্বরের কেবলমাত্র সান্নিধ্যরূপ সংযোগ-হেতু প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থা হন, যদিও ঈশ্বর স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকেন। এখানে আমাদের 'তৎ' এই শব্দটীর প্রকৃত অর্থ স্মরণ রাখিতে হইবে। এ বিষয়ে আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়া আসিয়াছি তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। [(১) দ্রষ্টব্য]

(৬) "বিশেষকার্য্যেষপি জীবানাম্",—অর্থাৎ "বিশেষ বিশেষ কার্য্যে জীবেরই অধিষ্ঠাতৃত্ব"। এই সূত্রটীর দ্বারা পূর্ব্বসূত্রটীর অর্থ পরিস্ফুত হইয়াছে। ইহার দ্বারা এই বুঝায় যে অন্ততঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও কার্য্যেই ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নাই। সসীম পুরুষ বা জীবেরাই

এই সকল কার্য্যের সাক্ষাৎ কর্ত্তা বা অধিষ্ঠাতা। কিন্তু এখানে এই আপত্তি উঠিতে পারে যে, যদি তাহাই হয়, শ্রুতি কেন এইরূপ মিথ্যা ঘোষণা করিলেন যে, ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্ব্বকই এই জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন? ইহার উত্তর নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

(৭) "সিদ্ধরূপবোদ্ধৃত্বাদ্ বাক্যার্থোপদেশঃ",—অর্থাৎ "শ্রুতিবাক্য যাঁহাদের বোধের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারা অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহারা ঐ সকল উপদেশের যথার্থ মর্ম্ম সম্যক্ অবধারণ করিতে পারিতেন। উক্ত প্রকারের বাক্য রচনা দ্বারা তদর্থই শ্রুতি তাঁহাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন।"

এখানে অপর একটী আপত্তি উঠিতে পারে:—ঈশ্বর যদি একেবারে নির্গুণ ও প্রকৃতিতে সর্ব্বপ্রকার আসক্তি-পরিশূন্য হন, তাহা হইলে প্রকৃতি কিরূপে তৎসংযোগে সৃষ্টি-সামর্থ্য লাভ করে? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

(৮) "অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বম্",—অর্থাৎ "প্রকৃত সৃষ্টিকার্য্য অন্তঃকরণেরই; কারণ, ইহা ঈশ্বর দ্বারা চেতনস্বভাব প্রাপ্ত, যেরূপ লৌহের পক্ষে"। অথবা আরও বিস্তৃতভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়,—লৌহ যেরূপ অগ্নির সান্নিধ্যে উত্তপ্ত হইয়া অগ্নিস্বভাব প্রাপ্ত হয়, এবং অপর বস্তুকে উত্তপ্ত ও দগ্ধ করে, অন্তঃকরণও সেইরূপ পরমাত্মা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সৃষ্টিশক্তি লাভ করে। এখানেও 'তৎ' এই শব্দটীর প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করিতে হইবে। অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞানভিক্ষু—ইঁহারা উভয়েই ইহার দ্বারা পুরুষ বা জীবাত্মাকেই বুঝিয়াছেন। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায় যে, ইহার দ্বারা ঈশ্বরকেই বুঝাইতেছে। তাহার কারণ—এই যুক্তিটী ৯২ সূত্রে যেখানে ঈশ্বরাস্তিত্বের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-প্রমাণ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, সেইখান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে; এবং ইহার পরবর্ত্তী সূত্রগুলি অন্যান্য সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া এই সিদ্ধান্তটীকেই দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং যে সমগ্র যুক্তিটীর জন্য আংশিকভাবে এতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সূত্রগুলির আলোচনা করা গেল, তাহা ঈশ্বর-সংক্রান্ত এবং মোটেই জীবাত্মা-সংক্রান্ত নহে; অর্থাৎ ঈশ্বরই এই সমগ্র যুক্তিটীর মুখ্য ও মূল বিষয়। অবশ্য, ৯৭ সূত্রে জীবাত্মার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা প্রসঙ্গতঃ ও অবান্তর মাত্র। সুতরাং 'তৎ' অর্থে সসীম পুরুষকে না বুঝিয়া ঈশ্বরকে বুঝাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত; কারণ তাহা দ্বারাই সমগ্র যুক্তির ধারাটী অটুট ও অবিচ্ছিন্ন থাকে।

খ—এইবার দ্বিতীয় শ্রেণীর সূত্রগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই সূত্রগুলির মধ্যে অন্ততঃ দুইটীকে (অর্থাৎ ষোড়শ ও সপ্তদশ সূত্র) যেন উহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলিয়া সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয়। সুতরাং এইগুলিকে সাবধানে পরীক্ষা করা আবশ্যক। বিজ্ঞানভিক্ষু মনে করেন যে, এই সূত্রগুলির উদ্দেশ্য পূর্ব্বপক্ষীদের ঈশ্বরের অস্তিত্বের অন্য প্রমাণ আছে বলিয়া যে প্রতিবাদ তাহার খণ্ডন করা। তিনি বলেন—"ঈশ্বরাসিদ্ধেরিতি যদুক্তং তন্নোপপদ্যতে, কর্ম্ম-ফলদাতৃতয়া তৎসিদ্ধেরিতি যে পূর্ব্বপক্ষিণস্তান্নিরাকরোতি" অর্থাৎ "ঈশ্বরাস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই এই উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ কর্ম্মফলদাতৃত্বের দ্বারাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীরা যে বলেন তাহারই নিরাকরণ করা হইতেছে"। অনিরুদ্ধ ভট্টের মত—"পূর্ব্বসিদ্ধম্ ঈশ্বরাসত্ত্বম্. ইদানীং ন্যায়েন আহ", অর্থাৎ "ঈশ্বরের নাস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব পূর্ব্বেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে যুক্তি বিস্তার করিতেছেন।" বেদান্তী মহাদেবও এইরূপ মনে করেন। কিন্তু কিরূপে তাঁহারা এইরূপ ধারণা করিলেন তাহা বুঝা বড়ই কঠিন। সূত্রগুলি একটু নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করিলে বেশ স্পষ্টই দেখা যায় যে, উহারা একেবারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকেই বুঝাইতেছে। এক্ষেত্রে সমস্ত যুক্তিটী ঈশ্বর যে নাই তাহা নহে, কিন্তু যেমন কেহ কেহ বলেন যে, তিনি অন্ততঃ সাক্ষাৎ সূত্রে বিশ্বের কল্পয়িতা, স্রষ্টা ও শাস্তৃরূপে সত্তাবান্ নহেন, এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং নিম্নলিখিত সূত্র হইতেই ইহার আরম্ভ হইয়াছে।

(৯) "নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ", অর্থাৎ "ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বে বা বিধাতৃত্বেই যে ফলনিষ্পাদন হয়, তাহা নহে, কিন্তু কর্ম্মের দ্বারাই ফলোৎপাদন হয়"। বিজ্ঞানভিক্ষু টীকা করিতেছেন—"ঈশ্বরাধিষ্ঠিতে কারণে কর্ম্মফলরূপ-পরিণামস্য নিষ্পত্তির্ন যুক্তা। আবশ্যকেন কর্ম্মণৈব ফলনিষ্পত্তিসম্ভবাদিত্যর্থঃ", অর্থাৎ "কারণ ঈশ্বর দ্বারা অধিষ্ঠিত হইলেই যে কর্ম্মফলরূপে তাহার বিপরিণতি ঘটে, ইহা ঠিক নহে; কারণ এই ফলবিপরিণাম বা ফলনিষ্পত্তি কেবলমাত্র কারণরূপ (আবশ্যক) কর্ম্মের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। ইহাই ইহার তাৎপর্য্য"। অনিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করেন—"যদি ঈশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা, কর্ম্মণা বিনাপি কুর্য্যাৎ? অথ কর্ম্মসহকারী কুরুতে, কর্ম্মৈব অস্তু, কিম্ ঈশ্বরেণ? ন চ সহকারী প্রধানশক্তিং বাধতে, স্বাতন্ত্র্যবিঘাতাৎ। কিঞ্চ স্বার্থপরার্থাভ্যাং প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা। ন চ ঈশ্বরস্য স্বার্থম্ অস্তি। পরার্থত্বে কারুণিকস্য দুঃখময়সৃষ্ট্যনুপপত্তিঃ। ন চ পরার্থপ্রবৃত্তিঃ, পরোপকারাদিনাঽপি স্বার্থলাভাৎ প্রবৃত্তেঃ। তস্মাৎ কর্ম্মৈব জগৎকারণম্ অস্তু।" অর্থাৎ "ঈশ্বর যদি স্বাধীন কর্ত্তাই হন,

তবে তিনি কর্ম্মব্যতিরেকেও করিতে পারেন। যদি বলা যায় যে ঈশ্বরই সৃষ্টি করেন, কর্ম্ম তাঁহার সাহায্য করে, তাহা হইলে কর্ম্মই কেন সৃষ্টির কারণ হউক না, ঈশ্বরের আবশ্যকতা কি? আবার সাহায্যকারী প্রধানশক্তিকে অর্থাৎ কর্ত্তাকে বাধা দিতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে তাঁহার স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটিবে। অধিকন্তু, দেখা যায় যে প্রবৃত্তি বা কর্ম্মেচ্ছা স্বার্থ এবং পরার্থ বৃত্তি হইতেই উদ্ভূত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কোনওরূপ স্বার্থেচ্ছা থাকিতে পারে না; এবং তাঁহার ইচ্ছা যদি পরার্থপর হইত, তাহা হইলে যিনি দয়ার আকর, তাঁহার পক্ষে এই দুঃখময় জগৎ-সৃষ্টি উচিত হয় না। আবার শুদ্ধ পরার্থপ্রবৃত্তিও বলা যায় না, পরোপকারাদির দ্বারাও সেই প্রবৃত্তির স্বার্থলাভ ঘটিতেছে, অর্থাৎ পরোপচিকীর্ষা এই প্রবৃত্তির মূলে থাকায়, এই প্রবৃত্তি স্বার্থপ্রণোদিত।" বেদান্তী মহাদেবও এইরূপই অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—ঈশ্বর কি কর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া সৃষ্টিকার্য্য করেন, অথবা কর্ম্মের উপর নির্ভর না করিয়াই সৃষ্টি করেন? যদি পূর্ব্ব কথাটী ঠিক হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর না হইয়া কেবল কর্ম্মই কারণ হউক। আর যদি পরবর্ত্তী কথাটী ঠিক হয়, তবে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত হয়। অধিকন্তু, ঈশ্বরের কার্য্য কি স্বার্থপ্রণোদিত না পরার্থপ্রণোদিত? প্রথমটী হইতেই পারে না, ঈশ্বর-ধারণার মূলেই ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে তাঁহার সকল ইচ্ছাই চরিতার্থ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়টী, অর্থাৎ তাঁহার কার্য্য পরার্থপ্রণোদিতও হইতে পারে না; কারণ, যিনি দয়াময়, এই দুঃখশোকপরিপূর্ণ সৃষ্টিতে তাঁহার প্রবৃত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না। এখন বেশ বুঝা যায় যে উপরি-উক্ত ব্যাখ্যাগুলি দেখাইতেছে যে (১) যাহা অস্বীকৃত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নয়, কিন্তু কৃতকর্ম্মের ফলদাতৃরূপ তাঁহার যে কারণত্ব, তাহাই; (২) কর্ম্ম স্বভাবতই নিজ নিজ ফল উৎপাদন করে, (৩) সুতরাং সেইজন্য ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন হয় না, (৪) এবং ঈশ্বরের পক্ষে কার্য্যকলাপও অযৌক্তিক বা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত সূত্রটী এই কথাগুলিই প্রতিপন্ন করিতে চাহে।

(১০) "স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ," অর্থাৎ "নিজের উপকারের জন্য হওয়ায় ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বেরই ন্যায়"। প্রত্যেক মনুষ্য যেরূপ প্রত্যেক কার্য্যটী নিজের উপকারের জন্যই করে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যও সেই-রূপ তাঁহার উপকারের জন্যই হইবে—এ কথা একেবারে অসম্ভব (absurd); কারণ তিনি পূর্ণ, তাঁহার নিজের নিকট হইতেও কোনও উপকারের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং তিনি কর্ম্মের প্রকৃত ফলদাতা নহেন। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সূত্রটী বলিতেছে না যে 'ঈশ্বর নাই'।

(১১) "লৌকিকেশ্বরবদিতরথা", অর্থাৎ "অন্যথা (অর্থাৎ সম্ভব হইলে) ঈশ্বর অপূর্ণকাম লৌকিক ঈশ্বর বা প্রভু হইয়া যাইবেন।" যদি মনে করা যায় যে ঈশ্বর তাঁহার নিজের হিতার্থেই কার্য্য করেন, তাহা হইলে তিনি লৌকিক ঈশ্বর অপেক্ষা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ নহেন। সুতরাং তাঁহাকে কার্য্যের ফলদাতা মনে করা যায় নাই। এই সূত্রেরও মর্ম্মার্থ এই নয় যে 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব না'।

(১২) "পারিভাষিকো বা", অর্থাৎ "তাহাতেও যদি এইরূপ পুরুষকে ঈশ্বর বলিতে হয়, তবে ঈশ্বর কেবল নামেই ঈশ্বর, অর্থাৎ তাঁহাতে ও মানবে কোনও প্রভেদ নাই"। এই সূত্রও—'ঈশ্বর যে নাই'—একথা বলিতে চাহে না।

(১৩) "ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ" অর্থাৎ "রাগ (অনুরাগ) ব্যতিরেকে সঙ্কল্পপূর্ব্বক কোন কার্য্যই হইতে পারে না, কারণ রাগই প্রত্যেক কার্য্যেরই প্রতিনিয়ত (invariable and unconditional) কারণ"। এই সূত্র এই বুঝাইতেছে যে যদি ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে তাঁহাতে রাগ অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু—

(১৪) "তদ্‌যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ", অর্থাৎ "তাঁহার সহিত এইরূপ অনুরাগের সম্বন্ধ স্বীকার করিলে তিনি নিত্যমুক্ত হইতে পারেন না।" এইটী এবং ইহার পূর্ব্বোক্ত সূত্রটী এই কথাই প্রমাণ করিতেছে যে, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না; কারণ, তাহা হইলে তাঁহাতে রাগ থাকিবে এবং তিনি নিত্যমুক্তস্বভাব হওয়াতে ইহার সহিত তাঁহার সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। সুতরাং, এই দুইটী সূত্র কেবল ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বই অস্বীকার করিতেছে, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছে না।

(১৫) "প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ", অর্থাৎ "প্রধানের (প্রকৃতির) শক্তির সহিত যুক্ত হওয়াতে যদি তাঁহার অনুরাগ উপজাত হয়, তাহা হইলে তাঁহাতে আসক্তি আরোপ করা হইবে।" এই সূত্রের অর্থ এই যে ঈশ্বর অসঙ্গ, শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন; সুতরাং প্রকৃতির সহিত যুক্ত হওয়ায় তাঁহার রাগ উৎপন্ন হইতে পারে না।

(১৬) "সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্", অর্থাৎ "জগতের সৃষ্টিবিষয়ে বস্তুতঃ ঈশ্বর কোনও কার্য্য না করিলেও কেবল তিনি আছেন বলিয়াই যদি তাঁহাকে জগতের কর্ত্তা বা বিধাতা বলা হয়, তাহা হইলে এরূপ জগৎকর্ত্তা প্রত্যে-ককেই বলা যাইতে পারে; কারণ তখন ঈশ্বর অর্থশূন্য